মুফতি রশিদ আহমদ রহ. | মুফতি তাকি উসমানি হাফি.

দুই মনীষীর পর্যালোচনায় সমকালের

রাষ্ট্র রাজনীতি ও ইসলাম

সাবের চৌধুরী

দুই মনীষীর পর্যালোচনায় সমকালের

রাষ্ট্র রাজনীতি ও ইসলাম

মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানবি রহ.
মুফতি তাকি উসমানি দা. বা.

সংকলন ও অনুবাদ : সাবের চোধুরী
শিক্ষক : দারুল ইরশাদ ওয়াদ দা'ওয়াহ আল ইসলামিয়া, হবিগঞ্জ

ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ের
পিডিএফ পেতে নিচের লিংকে
ক্লিক করে যুক্ত হোন আমাদের
টেলিগ্রাম চ্যানেলে.👇

https://t.me/islaMic_fdf

পুনরায়
প্রকাশন
www.punorayprokashon.com

প্রিয় বড় ভাইয়া মাওলানা নূরুল হুদা চৌধুরীকে।

যাকে দেখে আমি শিখেছি ভালো মানুষ মানে কী এবং কীভাবে তা হয়ে উঠতে হয়—বিচারে, বিবেচনায়, দয়ায়, মমতায়, ইনসাফে ও ভালোবাসায়।

পুনরায় প্রকাশনের অন্যান্য বই

- অল্প স্বল্প গল্প—আহমাদ ইউসুফ শরীফ
- আরতুগরুল গাজি—আইনুল হক কাসিমী
- আল-কুরআনে অনারব শব্দ—মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
- ইতিকাফ—সাদিক ফারহান
- ইতিহাস পাঠের পূর্বকথা—ইসমাইল রেহান
- ঈশ্বর আসেন কথাবার্তা বলি—সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর
- কতিপয় বৃহস্পতির দিনলিপি—আতিক ফারুক
- কারবালা কাহিনি ও তার প্রকৃত স্বরূপ—লুৎফুর রহমান ফরায়েজী
- জীবনে রোদ্দুরে—সাবের চৌধুরী
- তবু অনন্ত জাগে—হাসান আজীজ
- নতুন দিনের গল্প শোনো—নকীব মাহমুদ
- ফিলিস্তিন—ওয়াজেহ রশিদ হাসানি নদবি
- বিস্মৃত মনীষা—হাসান আজীজ
- বুনোফুলের দিন—আতিক ফারুক
- রোদফুল—মাসুম মুনতাসির
- সলংগা—আহমাদ সাব্বির
- সিরাত পাঠের পূর্বকথা—আমীর ইবনে আহমদ
- সিরাতে রহমতে আলম—সাইয়েদ সুলাইমান নদবি
- হারামাইনের স্মৃতিকথা—শুয়াইব আল হামিদ
- হিন্দুস্তানে মুসলমান—নুর আলম খলিল আমিনি

অনুবাদকের কথা

এ বইয়ে মোট তিনটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশটি পাকিস্তানের গ্র্যান্ড মুফতি জগদ্বিখ্যাত আলেম ও গবেষক আল্লামা তাকি উসমানি সাহেবের লেখা *হাকিমুল উম্মত কে সিয়াসি আফকার*-এর তরজমা। থানবি রহ. ছিলেন অতুলনীয় একজন মানুষ। শরিয়ত ও জাগতিক বহুবিধ জ্ঞানে উজ্জ্বল সূর্যের মতো, গভীরতর প্রজ্ঞাবান, বিস্ময়কর রকমের সূক্ষ্মদর্শী এবং সমাজ ও মানুষের আত্মার অভিজ্ঞ চিকিৎসক। বিভিন্ন বইয়ে তিনি রাজনীতি গণতন্ত্র সেক্যুলারিজম ফ্যাসিজম ইত্যকার নানা রাজনৈতিক বিষয়ে অসাধারণ ও লক্ষ্যভেদী সব মন্তব্য ও বিশ্লেষণ দেখিয়েছেন। আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি সেগুলোকে একত্র করে সুন্দর সুশৃঙ্খল, যথোপযোক্ত বিন্যাস ও ব্যাখ্যার সাথে গ্রন্থিত করেছেন। এর বিন্যাসের দেখাতে গিয়ে তিনি বলেন, থানবি রহ.-এর রাজনৈতিক দর্শনগুলোকে আমি মোট তিন ভাগে বিন্যস্ত করব—

১. ইসলামে রাজনীতির অবস্থান।
২. ইসলামের শাসনপদ্ধতি এবং সরকারের দায়িত্বসমূহ।
৩. ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক কর্মপন্থা ও সেগুলোর মূল্যায়ন।

পাঠক এতে খুঁজে পাবেন নিজের অনেক প্রশ্নের উত্তর।

দ্বিতীয় বইটি নিকটকালের আরেক বিখ্যাত মনীষী পাকিস্তানের মুফতি রশিদ আহমদ সাহেবের। এটি মূলত একজনের একটি প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব। প্রশ্নটি ছিল বর্তমানে ইসলামি রাজনীতিতে হেকমতের দোহাই দিয়ে অনেক নাজায়েজ কাজ পালন করা হচ্ছে দীনের নামে। এ ব্যাপারে শরিয়তের অবস্থান কী? চলমান পৃথিবী, রাজনৈতিক বাস্তবতা ও তৎসংশ্লিষ্ট উপযুক্ত বিবেচনা মাথায় রেখেই তিনি তাঁর মুফতিসুলভ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন শরিয়তের চোখে এমন কাজের বাস্তবতা কী। কুরআন ও হাদিসের উসুল ও ফিকহের দলিলের আলোকে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলির উদ্ধৃতি দিয়ে। এবং শেষে বক্তব্যকে আরও শক্তিশালী ও দ্ব্যর্থহীন করার জন্য অনেকগুলো আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করে দিয়েছেন। সচেতন পাঠক তার বিস্তারিত আলোচনাটি মাথায় রেখে আয়াত ও হাদিসগুলো গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ করলে সহজেই ধরতে পারবেন এসবের যথার্থতা।

তৃতীয় অংশে রয়েছে মরক্কোর প্রথিতযশা আলেম ইসলামি চিন্তক ও গবেষক ড. বশির ইসাম লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *আল-আলমানাতু মিনাদ দাখিল* বইয়ের ভূমিকার তরজমা। এতে তিনি অত্যন্ত সংক্ষেপে সহজ ভাষায় 'সেক্যুলারিজম' ধারণাটির পরিচয় দিয়ে এটি কেন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক তা ব্যাখ্যা করেছেন। সেই সাথে দেখিয়েছেন সমকালে এটি কোন আঙ্গিকে ইসলামি রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে সেই সূক্ষ্ম ও গোপন পথটি। পেছনের আলোচনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও সহায়ক হওয়ার বিবেচনা থেকে সে অংশটুকু এখানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে অনেকটা উপসংহারের মতো করে।

এখনের এই সময়ে যখন রাজনৈতিক বিষয়াবলিতে মানুষ দিকভ্রান্ত হচ্ছে নানা সূত্রে, তখন এ বই ইনশাআল্লাহ আপনার ভেতরে একটি সুন্দর প্রশান্তি ও স্থিতি তৈরি করবে নিঃসন্দেহে।

অভিজ্ঞ পাঠক এসব আলোচনার কোথাও কোথাও হয়তো একমত হতে পারবেন না, কিন্তু সে জায়গাগুলোও আপনার চিন্তাকে শানিত করবে বলাই বাহুল্য। আর, দ্বিমতের দরজা তো সবসময়ই খোলা। শুধু দুটো বিষয় মাথায় রাখতে হবে—আমাদের দ্বিমত যেন হয় অবশ্যই শরিয়তের দলিলের আলোকে। ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা, আবেগ ও স্পৃহা, পরিস্থিতির চাপ, ইনফরমেশন গ্যাপ, দলিল জানা না থাকা ইত্যাদির দ্বারা আমাদের দ্বিমত যেন প্রভাবিত না হয়। শরিয়তের মধ্যে সকল কালের সকল উদ্ভূত পরিস্থিতিতে, সক্ষমতা ও অক্ষমতার সময়ে এবং যুগ ও চাহিদার প্রেক্ষিতে যখন যেভাবে যে আঙ্গিকে সমস্যা সৃষ্টি হবে সবকিছুর যুতসই সমাধান রয়েছে। আমাদের যেন কখনোই এ দুষ্ট চিন্তা পেয়ে না বসে যে—'ফতোয়া দিয়ে রাজনীতি চলে না; আলেম ও মুফতিগণ যাপিত জীবনের মাসআলা-মাসায়েল দেবেন; রাজনীতির সমাধান ও বিশ্লেষণ তাদের থেকে গ্রহণ করা ভুল'। এই চিন্তা গুঢ়ার্থে শরিয়তের সামগ্রিকতাকে অস্বীকার করার নামান্তর।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে, তা হল, বিশেষত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে ইসলামি বিধানাবলির দুটো দিক আছে। এক হল এর মূল রূপটি। আরেক হল এর প্রয়োগ পদ্ধতি। কোন বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত অকাট্য হয়েও প্রয়োগের ধরনে গিয়ে আলেম ও মুফতিদের মধ্যে মতভিন্নতা দেখা দিতে পারে। এ জায়গাটিতে আমাদের দায়িত্ব হল একচেটিয়াভাবে নিজের বিশ্লেষণকে একমাত্র সঠিক দাবি করে অন্য সকল বিশ্লেষণকে ইসলামবিরোধী সাব্যস্ত করে না বসা। বরং, নিজের বক্তব্য বিশ্লেষণ ও দলিল হাজির করে অন্যের দলিলসমৃদ্ধ বক্তব্য শোনার মানসিকতা বজায় রাখা এবং দলিলের আলোকে কোনো বক্তব্য যদি সঠিক মনে হয়, তাহলে নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করা। শুধুমাত্র নিজের এতদিনকার লালিত সিদ্ধান্ত বাদ দিতে হবে বা

অনুককে মেনে নিতে হবে কিংবা সিদ্ধান্তটা আমার পছন্দ হচ্ছে না—এসব কারণ যেন আমাকে সত্য হতে বিচ্যুত না করে। সবসময় মনে রাখতে হবে, নিজের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ ইত্যাদি সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিতে হবে শরিয়তের দলিলকে। এভাবেই পরস্পর আদানপ্রদানে তুলনামূলক ভালো একটি সিদ্ধান্তে গিয়ে আমরা উপনীত হতে পারব।

পুনরায় প্রকাশনের স্বত্বাধীকারী নাসিম মুমতাজী বইটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুবাদ করার প্রস্তাব করেন। মুফতি তাকি উসমানি সাহেবের বইটি আগেই পড়েছিলাম। এবার মুফতি রশিদ আহমদ রহ.-এর ফতোয়াটাসহ পড়ার সুযোগ হল। মনে হল এই বই আমাদের দেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে হাজির থাকা একান্ত দরকার। কিছুদিন আগে ড. বশির ইসাম রচিত *আল-আলমানাতু মিনাদ দাখিল* বইটি পড়ার সুযোগ হয়েছিল। অত্যন্ত মূল্যবান একটি রচনা এটি। হালে ইসলামি রাজনীতি কীভাবে বিবর্তিত হয়ে কোন কোন সময় ভিন্ন একটি দিকে মোড় নিচ্ছে, তিনি তার কারণ সন্ধান করেছেন, সূত্রগুলো দেখিয়েছেন, স্তরগুলোর বিন্যাস করেছেন এবং বর্তমানে দুঃখজন সামগ্রিক একটি চিত্র দেখানোর চেষ্টা করেছেন। আগ্রহী পাঠকগণ আরবি ভাষায় লিখিত পুরো বইটি পাঠ করতে পারেন। অনেক কিছুর দিশে পাওয়া যাবে এতে, ইনশাআল্লাহ। আমরা সে বইটির শুরুর অংশটি প্রসঙ্গত এখানে যুক্ত করে দিয়েছি।

তিন অংশে বিভক্ত আমাদের এ বইটি পাঠকের দীনি চেতনাকে শানিত করুক, রাজনীতি সচেতন করুক এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে সত্যিকারের একটি পরিবর্তনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও সংগ্রামী করে তুলুক—এই কামনা। কাজ করতে গিয়ে মানুষ হিসেবে ভুলত্রুটি থেকে যাবে অবশ্যই। এমন কিছু নজরে পড়লে আমাদের অবহিত করার সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল। আল্লাহ তায়ালা বইয়ের লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠক সকলকে এ থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দিন এবং সমস্ত আমল কবুল ও মঞ্জুর করুন। আমিন।

—সূচি—

থানবি রহ.-এর রাজনৈতিক চিন্তা ও সমকালের রাজনীতি :: ১১

ইসলামে রাজনীতির অবস্থান :: ১৪

ইসলামের শাসনব্যবস্থা :: ১৮

ব্যক্তিশাসন :: ২৫

শাসন : একটি দায়িত্ব, অধিকার নয় :: ৩৩

শাসকের দায়িত্ব :: ৩৩

রাজনৈতিক তৎপরতার গুরুত্ব ও সীমারেখা :: ৩৭

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও চারিত্রিক শুদ্ধতা :: ৪০

রাজনৈতিক কৌশল ও কিছু কথা :: ৪৪

বয়কট ও হরতাল :: ৪৭

আমরণ অনশন :: ৪৯

রাজনৈতিক পাবলিসিটির প্রচলিত রূপ :: ৫০

শাসকদের সাথে আচরণপদ্ধতি :: ৫২

ইসলামবিরোধী আইন ও শরিয়তবিরোধী পদক্ষেপে করণীয় :: ৫৫

সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ :: ৫৭

শরিয়তের বিধান লঙ্ঘন ও একটি পর্যালোচনা :: ৬১

ইসলাম ও সেক্যুলারিজম :: ১০১

সেক্যুলারিজমের পরিচয় :: ১০১

মুসলিম সেক্যুলারদের নতুন ব্যাখ্যা :: ১০২

সেক্যুলারিজমের সূচনা ও পরিণতি :: ১০৩

এ বইয়ের আলোচ্য সেক্যুলারিজম :: ১০৪

সীমিত করার কারণ :: ১০৪

সেক্যুলারিজমের প্রকরণ ও বিন্যাস :: ১০৫

সেক্যুলারিজমের নেতিবাচক প্রভাব :: ১০৫

ইউরোপে যেভাবে গড়ে উঠল সেক্যুলারিজম :: ১০৬

শরিয়তের দৃষ্টিতে সেক্যুলারিজমের বিধান :: ১০৭

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতার সংঘাত :: ১০৮

মুসলিম সেক্যুলারদের ইমানের ধরন :: ১১০

সেক্যুলারিজম মুসলিমজাতির মধ্যে ছড়াল যেভাবে :: ১১১

হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রহ.-এর

রাজনৈতিক চিন্তা ও সমকালের রাজনীতি

হজরত হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রহ. পৃথিবীতে অসামান্য একটি জীবন কাটিয়ে গেছেন। আল্লাহ তায়ালা আপন অনুগ্রহে তাকে সে তাওফিক দান করেছিলেন। তার কর্মের পরিধি এত বিস্তৃত ছিল, বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। সম্ভবত মুসলমানদের দীনি প্রয়োজনের এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে তার কোনো না কোনো কাজ পাওয়া যাবে না—সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত। ব্যাপারটা এমন ছিল না যে, তিনি একজন জ্ঞানী মানুষ ছিলেন, এবং সে জ্ঞানের তাড়না থেকে নানা বিলাসিতামূলক গবেষণায় সময় কাটিয়েছেন; বরং তার গ্রন্থ, আলোচনা ও বিভিন্ন মজলিসে করা সারগর্ভ উক্তিসমূহ সমকালের সমস্ত ধর্মীয় প্রয়োজন কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এবং মুসলিম জীবনের সার্বিক বিষয়ে দীনি শিক্ষা ও নির্দেশনা নানাভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে পরিষ্কারভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

এই লেখাটিতে আমি তার রাজনৈতিক চিন্তাগুলো বিশ্লেষণ করার চেষ্ট করব। যদিও তিনি কোনো বিচারেই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, রাজনীতি তার বিষয়ও ছিল না; এ কারণে নিরেট রাজনীতি নিয়ে তার আলাদা কোনো গ্রন্থ নেই; কিন্তু ইসলামের বিধানাবলি যেহেতু জীবনের অন্যান্য শাখার মতো রাজনীতির সাথেও সংশ্লিষ্ট, তাই শরিয়তের বিধানাবলি ব্যাখ্যা করার সময় প্রসঙ্গক্রমে এটিও তার আলোচনায় এসেছে এবং এসব বিষয়ে তিনি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ আলোচনা করেছেন, পাশাপাশি সমকালের অন্যান্য রাজনৈতিক মতবাদ ও রাজনীতির ময়দানে প্রচলিত চিন্তা ও কর্মগত ভ্রান্তিগুলোর ব্যাপারেও পরিপূর্ণ পর্যালোচনা হাজির করেছেন। এই লেখায় আমরা তার সে সমস্ত আলোচনা পাঠ করব। আশা করছি এর ভেতর দিয়ে হাকিমুল উম্মতের চোখে ইসলামের রাজনীতি-দর্শনটির একটি উজ্জ্বল চিত্রও আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

বর্তমান পৃথিবীতে যে রাজনৈতিক মতবাদগুলো বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, সেগুলো যুগের পর যুগ মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্ক শাসন করছে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা

বিষয়ে এমন কিছু রূপরেখা, ধারণা ও বিশ্বাস গেঁথে দিয়েছে, এখন চাইলেও কেউ নিজের চিন্তাকে এসবের করাল গ্রাস থেকে সহজে মুক্ত করতে পারবে না। এই রাজনৈতিক মাতব্বর গোষ্ঠীটি নিজেদের সুবিধামতো ভালো আর মন্দের বিশেষ একটি ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এর পক্ষে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে বিশ্বব্যাপী জোরালো প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে যুগ যুগ ধরে। বর্তমানে পরিস্থিতিটা এমন, এসবের বিপরীতে টু শব্দটি করার কথাও মানুষ ভাবতে পারে না। প্রোপাগান্ডার সে ভয়াবহ মেশিনটি মানুষের চিন্তাপদ্ধতির খোলনলচেটাই আমূল বদলে দিয়েছে, ফলে তারা প্রশ্নহীনভাবে এই দর্শনগুলোকে মেনে নিয়েছে অমোঘ সত্যের মতো। এমন যে, এর বিপরীত কিছু সামনে এলে চমকে ওঠে, বিস্মিত হয়, এরপর এগুলোকে নিয়ে হাস্যরসে লিপ্ত হয়। দ্বিতীয়ত, কোনো মানুষ চিন্তাগতভাবে এই দর্শনগুলোর সাথে দ্বিমত পোষণ করলেও প্রকাশ্যে কিছু বলতে সাহস করে না। কারণ, এসব বলতে গেলেই পৃথিবীজুড়ে তার বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় উঠবে। সুতরাং চুপ থাকাই নিরাপদ। এ কারণে সমকালে কেউ যখন ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনটির ব্যাখ্যা করেন, তখন হালের এই ফ্যাশনেবল ধারণাগুলোর হাত থেকে বাঁচতে পারেন না। এই তালিকায় অনেক ভালো ভালো চিন্তক আছেন, এমনকি অনেক আলেম পর্যন্ত। এই প্রবণতার কারণে তারা যখন ইসলামের কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক রোডম্যাপটি বিস্তারিতভাবে বলতে যান, তখন কথিত আধুনিক সে ধারণাগুলো ধার করে এনে অত্যন্ত যত্নের সাথে ইসলামকে এসবের মধ্যে ফিট করে দেখানোর চেষ্টায় লিপ্ত হন। তাদের কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় বর্তমান সময়ে ইসলাম ব্যাখ্যায় এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। এসব কারণে ইসলামের রাজনীতি দর্শনের মতো স্পর্শকাতর বিষয়টি নিতান্ত ধোঁয়াশাপূর্ণ হয়ে গেছে এবং বাস্তব চিত্রটি বহু চিন্তা জঞ্জালের নিচে চাপা পড়ে আছে।

আমাদের সোভাগ্য যে, হাকিমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ.-কে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ১৪ শতকে এসে দীন সংস্কারের বিরাট একটি কর্মযজ্ঞ সাধন করিয়েছেন। এমন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কাজটি সে ব্যক্তির পক্ষেই করা সম্ভব, যিনি সর্বোতভাবে দীনের রঙে রঙিন হয়েছেন এবং কুরআন-সুন্নাহ ও শরিয়তের অপরাপর উৎস হতে সরাসরি জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে এমন মজবুতভাবে গড়ে তুলেছেন যে, তার মধ্যে অন্য কোনো চিন্তা ও মতবাদ সামান্য ছায়াপাত করতে পারে না। এমন ব্যক্তিরা সমকালকে জানেন ঠিক; কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গ্রহণ করেন কেবল সে বাণীটুকু, যেটুকু শরিয়তের সাথে সন্দেহাতীতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

তারা পৃথিবীর দিকে পূর্ণ চোখ মেলে নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে থাকেন, কিন্তু প্রোপাগান্ডা যত প্রবলই হোক, তাদের বিচলিত করে না, ভীতও করতে পারে না।

যদি ধরেও নিই কোনো এক বিচিত্র কারণে পৃথিবীর সকল মানুষ কোনো একদিকে চলে গেছে, তখনো তারা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহে নিজের সেই অবস্থানটিতে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, যেটি শরিয়তের মানদণ্ডে সত্য ও সঠিক এবং নিজের কথাটি উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করেন। এ কাজে তাদের কোনো দ্বিধা থাকে না, লোকলজ্জার ভয়ও না।

রাজনীতি বিষয়েও হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রহ. সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর অটল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং সেই সময়টিতে, যখন নানা ভ্রান্ত মতবাদের সংমিশ্রণ ইসলামের রাজনৈতিক শিক্ষা ও নির্দেশনাগুলোকে ধোঁয়াশাপূর্ণ করে দিয়েছিল, তখনো তিনি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহে সেগুলোকে অবিকৃত ও বিশুদ্ধরূপে উপস্থাপন করেছিলেন; প্রোপাগান্ডা-সৃষ্ট উত্তেজনা ও ভ্রান্তির সামনে নতজানু হননি, মানুষ কী বলছে সে পরোয়াও করেননি।

যেহেতু সমকালের রাজনীতি বিশেষ এক চরিত্র ধারণ করেছে এবং তাতে নিজেদের তৈরি কিছু বিষয়কে মূলনীতি হিসেবে এমনভাবে গ্রহণ করা হয়েছে যে, এর বিপরীত কিছুর চিন্তাই করা যায় না, তাই হজরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর রাজনৈতিক চিন্তাগুলো এই ধারার লোকেদের কাছে খুবই অদ্ভুত মনে হবে। কারণ, পশ্চিমা রাজনীতির দর্শন তাদের মন ও মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দুঃখজনক হল, এই ধারায় এমন অনেক ইসলামি দলও আছে, যারা মুখে মুখে দাবি করে—আমাদের সকল রাজনৈতিক প্রচেষ্টার লক্ষ্য ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা; কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই চিন্তাগুলো থানবি রহ.-এর ব্যক্তিগত দর্শন নয়; বরং এসব তিনি গ্রহণ করেছেন সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ এবং খোলাফায়ে রাশেদার কর্মপদ্ধতি থেকে। সমগ্র চিন্তাটি গড়ে উঠেছে শরিয়তের মূল উৎস থেকে গৃহীত প্রমাণ ও সর্বজনগৃহীত মানুষের স্বভাবজাত যুক্তির আলোকে। এজন্য খুব ঠান্ডা মাথায় এগুলো পাঠ করতে হবে এবং সম্পূর্ণ নির্মোহ বিচার করতে হবে, যেন কাঙ্ক্ষিত সত্য মেঘের আড়াল হতে বেরিয়ে এসে আমাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক আলোকিত করতে পারে।

২.

থানবি রহ.-এর রাজনৈতিক দর্শনেগুলোকে আমি মোট তিন ভাগে বিন্যস্ত করব—

1. ইসলামে রাজনীতির অবস্থান।
2. ইসলামের শাসনপদ্ধতি ও সরকারের দায়িত্বসমূহ।
3. ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক কর্মপন্থা ও সেগুলোর মূল্যায়ন।

এক. ইসলামে রাজনীতির অবস্থান

ইসলামে রাজনীতির অবস্থান কী? শরিয়তের দৃষ্টিতে একটি শুদ্ধ সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব কতটুকু?

খ্রিষ্টানদের তৈরি এই বিভ্রান্ত কথাটি খুবই প্রসিদ্ধ : কায়সারকে কায়সারের কাজ করতে দাও, আর

গির্জাকে গির্জার কাজ। এর সারমর্ম এই— রাজনীতিতে ধর্মের কোনো ভূমিকা নেই এবং ধর্ম ও রাজনীতির কর্ম-অঞ্চল সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং, একটি অপরটির বিষয়ে নাক না গলিয়ে সকলে নিজের কাজটি করে যাক। রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা করার এই দর্শনটি দীর্ঘদিন যাবৎ চর্চা করা হয়েছে এবং এই সময়ে আমাদের মধ্যে সেক্যুলারিজম শিরোনামে এসে হাজির হয়েছে। বর্তমান রাজনীতিধারায় এই মতবাদটিই সবচেয়ে বেশি স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য মতবাদ। বলাই বাহুল্য, ইসলামে এ ধরনের বিভ্রান্ত চিন্তার কোনো সুযোগ নেই। ইসলামে শিক্ষা ও নির্দেশনা যেহেতু জীবনের সকল শাখায় বিস্তৃত, যার মধ্যে রাজনীতিও অন্তর্ভুক্ত, তাই রাজনীতিকে ইসলাম থেকে সরিয়ে রাখার সামান্য সুযোগ নেই।

ফলে, বর্তমানের অনেক মুসলিম গবেষক অত্যন্ত জোরালোভাবে এই ভ্রান্ত চিন্তাটি প্রতিরোধ করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন রাজনীতিকে ইসলাম থেকে কোনোভাবেই পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। মরহুম কবি ইকবাল কী দারুণ করে বলেছেন, রাজনীতি থেকে ইসলাম নির্বাসিত হলে চারদিকে ছড়াবে চেঙ্গিসের হিংস্রতা।

কিন্তু দুঃখজনক হল, সেক্যুলারিজম তথা রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা করার এই দর্শন প্রতিরোধ করতে গিয়ে অনেক মুসলিম গবেষক খুব সূক্ষ্ম

আরেকটি ভুল করে বসেছেন—যা দেখতে মামুলি মনে হলেও এর নেতিবাচক প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী ও গভীর।

এই সূক্ষ্ম ভুলটি সংক্ষিপ্ত শব্দে বলতে হলে এভাবে বলা যায়—তারা সেক্যুলারিজম প্রতিরোধ করার উত্তেজনায় পড়ে রাজনীতিকে ইসলামিকরণের বদলে ইসলামকে রাজনীতি সর্বস্ব করে দিয়েছেন। বলা দরকার ছিল—রাজনীতি ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না; কিন্তু তারা বলে বসেছেন : ইসলাম রাজনীতি থেকে আলাদা হওয়া উচিত নয়।

একটু ব্যাখ্যা করে বলা যাক : রাজনীতি ও রাষ্ট্রশাসন ইসলামের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামের বিধানগুলোর মধ্যে অনেক বিধান রয়েছে রাজনীতি সংশ্লিষ্ট, এবং ইমানের দাবিও এটিই—প্রত্যেক মুসলমান অন্যান্য বিধানের মতো সাধ্যমতো এ বিধানগুলোও নিজেরা পালন করবে, অন্যদেরকে এর ওপর উঠিয়ে আনবে, বিচারকগণ এসবের আলোকেই বিচারকার্য পরিচালনা করবেন, সাধারণ জনগণের জন্যও আবশ্যক হল ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম জারি রাখা এবং প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এর অনুগত হয়ে চলা। এটা নিরেট সত্য বিষয়। অস্বীকারের কোনো উপায় নেই।

কিন্তু সমকালের কিছু চিন্তাবিদ ও লেখক সেক্যুলারিজম প্রতিরোধ করতে গিয়ে এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন যে, রাজনীতি ও রাষ্ট্রশাসনকে

ইসলামের মূল লক্ষ্য, পৃথিবীতে নবিগণ আগমনের একমাত্র কারণ; বরং পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা দিয়ে বসেছেন। এদিকে ইসলামের অন্যান্য বিধান শুধু যে দ্বিতীয় স্তরের বিষয় তা-ই না; বরং এগুলোর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও তাৎপর্য অস্বীকার করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নিছক মাধ্যম ও ট্রেইনিং হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

এই প্রান্তিক চিন্তার অনেক ক্ষতি আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় ক্ষতিটি হল—এর দ্বারা দীনের সামগ্রিক ধারণা ও অর্ডার অব প্রায়োরিটিই উলটে গেছে। যে জিনিসটি মাধ্যমমাত্র ছিল, সেটি মূল উদ্দেশ্যে পরিণত হয়ে হৃদয়-মস্তিষ্কে গেঁথে গেছে, আর মূল উদ্দেশ্যটি অগুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে পর্যবসিত হয়ে চোখের আড়ালে চলে গেছে। ফলে, এই দর্শনাক্রান্ত মানুষজন মনে করেন রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার সংশোধন করাই হল একজন মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। কাজের কাজ সেটিই যা এ পথে সম্পাদন করা হয়; কুরবানি ও আত্মত্যাগ মূলত সেগুলোই, যা এর পেছনে উৎসর্গ করা হয়, এবং প্রকৃতপক্ষে আদর্শ মানুষ তাকেই বলা যায়, যে স্বপনে জাগরণে রাজনীতিকে নিজের ধ্যান-জ্ঞান বানিয়ে পুরো জীবন এর জন্য ওয়াকফ করে দেয়।

অপরদিকে ইবাদত বন্দেগি আত্মশুদ্ধি জুহদ তাকওয়া অন্যান্য আহকাম শুধু যে গুরুত্বহীন তা-ই না; বরং যারা গুরুত্ব দিয়ে এসব কাজে নিবেদিত হয়,

তাদের কটাক্ষ করা হয়, বিদ্ধ করা হয় বিদ্রুপের বানে। মনে করা হয় বোকা লোকগুলো দীনের মূল উদ্দেশ্য রাজনীতি বাদ দিয়ে অবুঝের মতো অগুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক বিষয়গুলোতে পড়ে রয়েছে এবং মূল কাজ ফেলে বিভ্রান্তিতে ডুবে আছে। এভাবেই এই প্রান্তিক চিন্তাটি দিয়ে মুসলিম সমাজের মধ্যে একটি ভুল দর্শন, অযাচিত বিভাজন ও শ্রেণিবিদ্বেষ গড়ে তোলা হয়েছে।

দ্বিতীয় বড় ক্ষতিটি হল এই—যখন রাজনীতি ও রাষ্ট্রশাসনকে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য এবং ইবাদতসহ অন্যান্য বিধানকে স্রেফ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হবে, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই এই মানসিকতা তৈরি হবে যে, কোনো কোনো সময় এই 'মাধ্যমগুলো'কে মূল উদ্দেশ্যের খাতিরে কুরবানি করে ফেলা যাবে এবং মূল লক্ষ্যটি অর্জনের খাতিরে এসবের মধ্যে কমবেশ হয়ে গেলে তেমন কোনো ক্ষতি বা আপত্তির কিছু নেই। এবং আমরা দেখি বাস্তবে হয়েছেও তাই। রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে গিয়ে ইবাদত ও অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি হওয়াকে তেমন কিছু মনে করা হয় না। এই প্রান্তিক চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে সচেতনে বা অবচেতনে মানুষ এমন ভয়াবহ একটি মানসিকতা গ্রহণ করে ফেলেছে।

রাজনীতি ও রাষ্ট্রশাসনকে দীনের বিশেষ একটি শাখা বিবেচনা না করে মূল উদ্দেশ্য বানিয়ে ফেলাটা কেমন? আমরা দেখি ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে

অনেক বিধান ও নির্দেশনা রয়েছে, পাশাপাশি হালাল উপার্জনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে অনেক আয়াত-হাদিসে। হালাল উপার্জনের মাহাত্ম্য ও প্রশংসার হাদিসগুলো দেখিয়ে কেউ যদি দাবি করে বসে—ইসলামের মূল উদ্দেশ্যই হল ব্যবসা-বাণিজ্য করে সাবলম্বী হওয়া, এটা যেমন হাস্যকর, রাজনীতিকে মূল উদ্দেশ্য হিসেবে দেখানোও তেমনই—হাস্যকর ও অজ্ঞতাপূর্ণ প্রান্তিক একটি চিন্তা।

হুবহু রাজনীতিও দীনের একটি শাখা, এই অর্থে যে, ইসলামে রাজনীতিসংশ্লিষ্ট অনেক বিধান রয়েছে, এর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদিস অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু সেসবের ওপর ভর করে রাজনীতিকে দীনের মূল উদ্দেশ্য বানিয়ে দেওয়াটা অনেক বড় ভুল।

হিজরি ১৪ শতকের শুরুতে মুসলমানদের মধ্যে একটি বিশেষ জাগরণ দেখা দিল। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য দিকে দিকে শুরু হল মুক্তির লড়াই। এ সময়টিতে তাদের মধ্যে প্রান্তিক এই দর্শনটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তখন রাজনীতি ও রাষ্ট্রশাসনকে 'আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খেলাফত' বা 'খোদায়ি শাসন' নাম দিয়ে রাজনীতিকে দীনের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। চিন্তাগত এই ভুলটি মুসলমানদের মাঝে এমন চুপিসারে জায়গা করে নিল, ভালো ভালো সচেতন মানুষ পর্যন্ত টের পেল না তাদের চিন্তাপথটি

কীভাবে উলটে যাচ্ছে। সে ডামাডোলের সময়ে রাজনৈতিক মুক্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজন মানুষের মন-মস্তিষ্কে এমন গভীর ছায়াপাত করল, এই সূক্ষ্ম কিন্তু সুদূরপ্রসারী ভুলটি ধরতে পেয়ে যে শরিয়তের দৃষ্টিতে রাজনীতির সঠিক অস্থানটি নির্ণয় করবে সে ফুরসত মিলল না। ফলাফল দাঁড়াল এই যে, অনেকে একে কবুল করলেন সজ্ঞানে, অনেকে এই ফাঁদে আটকে গেলেন নিজেদের অজান্তেই। আন্দোলন ও সংগঠনগুলোর সম্মিলিত কর্মযজ্ঞ এর শুদ্ধতা এত মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করল, জ্ঞানী মানুষেরা পর্যন্ত সচেতন হওয়ার সুযোগ পেলেন না।

এমন পরিস্থিতিতে অধমের জানামতে হজরত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ.-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি সূক্ষ্ম এই ভুলটি ধরতে পারেন এবং অসামান্য কয়েকটি মাত্র বাক্যে কুরআন-হাদিসের আলোকে প্রমাণ করেন দীনের মধ্যে রাজনীতি ও রাষ্ট্রশাসনের সঠিক অবস্থাটি আসলে কী? তিনি বলেন : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, তাদের যদি আমি পৃথিবীতে হুকুমত দান করি, তাহলে তারা যথাযথ সালাত আদায় করবে, জাকাত প্রদান করবে, সৎ কাজের প্রতি আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেবে। এবং সকল কর্মের শেষ পরিণতি আল্লাহর হাতেই।

এ থেকে প্রমাণিত হয়—শরিয়তে রাজনীতি, রাষ্ট্রশাসন ও জিহাদ মূল উদ্দেশ্য নয়; মূল উদ্দেশ্য হল দীনদারি। রাজনীতি ও জিহাদ পৃথিবীতে দীনদারি

প্রতিষ্ঠার বিশেষ একটি মাধ্যমমাত্র। এ কারণেই নবিগণের সকলকে দীনদারি ও এ সংক্রান্ত বিধানাবলি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রশাসন ও জিহাদের বিধান সকলকে প্রদান করা হয়নি; বরং যেখানে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং কল্যাণকর মনে হয়েছে, সেখানেই কেবল এ দুটোর সুযোগ ও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমগুলোর চরিত্র ও অবস্থান এমনই হয়—প্রয়োজন হলে অবলম্বন করা হবে, অন্যথায় নয়।

কারও মনে হতে পারে—অন্য আয়াতে তো এর বিপরীত কথা বলা হয়েছে। সেখানের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় দীনদারি হল স্রেফ মাধ্যম এবং রাজনীতি ও রাষ্ট্রশাসন হল মূল লক্ষ্য।

আয়াতটি হল : তোমাদের মধ্য থেকে যারা ইমান আনবে, নেক আমল করবে, আল্লাহ অঙ্গীকার করছেন, অবশ্যই তাদের পৃথিবীতে খেলাফত (রাষ্ট্রক্ষমতা) দান করবেন; যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের দান করেছেন। আরও প্রতিষ্ঠা দান করবেন সেই দীনের যা তাদের জন্য আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

এ আয়াতে ইমান ও নেক আমলকে রাষ্ট্র-ক্ষমতা লাভের শর্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় রাষ্ট্র-ক্ষমতাই হল মূল। এর জবাব হল—এখানে ওয়াদা করা হয়েছে মানুষ যদি ইমান এনে নেক আমল করে, তাহলে তাদের শক্তি ও ক্ষমতা দেওয়া হবে। এবং স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা হয়েছে, সঠিকভাবে দীন পালন করলে শক্তি ও ক্ষমতা

আসবেই। সুতরাং, রাষ্ট্র-ক্ষমতা লাভ ও শক্তিপ্রাপ্তি হল একটি পুরস্কার, যা দেওয়ার ওয়াদা করা হয়েছে যদি সঠিকভাবে দীন পালন করা হয়। কিন্তু প্রতিশ্রুত বিষয়টি মূল উদ্দেশ্যে পরিণত হওয়া আবশ্যক নয়। যদি তা-ই হত তাহলে সামনের আয়াতটির কারণে বলতে হত বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা দীনের মূল উদ্দেশ্য। আয়াতটি হল এই : যদি তারা তাওরাত, ইঞ্জিল ও তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব—কুরআনকে পুরোপুরি অনুসরণ করত, তাহলে তারা ওপর ও তলদেশ থেকে অবাধে রিজিক লাভ করত।

দেখা যাচ্ছে, তাওরাত ইঞ্জিল কুরআন—অর্থাৎ, কুরআনুল কারিমকে মেনে চললে রিজিকে প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এখন কেউ কি বলতে পারবে রিজিকে প্রশস্ততা লাভ করা দীনের মূল উদ্দেশ্য? বরং এ আয়াতের দ্বারা শুধু এটুকু বোঝানো হয়েছে—দীন মেনে চললে দীনদার মানুষেরা কখনো অন্ন-বস্ত্রহীন থাকবে না। ঠিক তেমনই যথাযথভাবে দীন পালন করলেও মুসলমানদের শক্তি ও শাসনক্ষমতা দেওয়া হবে। এ কথা না বলে বিষয় দুটোকে সরাসরি মূল উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়।

যা-ই হোক, এ কথা স্পষ্ট হল—রাজনীতি ও দীনদারী এ দুয়ের মাঝে শাসনক্ষমতা হল মাধ্যম পর্যায়ের বিষয় এবং দীনদারী লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য। তবে, এখান থেকে এটা বোঝা যাবে না যে, রাজনীতি

গুরুত্বহীন। এই ভুল বোঝার কোনো সুযোগ নেই। আমরা শুধু এ দুয়ের মধ্যে কোনটি লক্ষ্য ও কোনটি মাধ্যম সে বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাচ্ছি।[1]

সত্য হল, হজরত হাকিমুল উম্মত রহ. একটিমাত্র পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ এই আলোচনার দ্বারা পুরো বিষয়টিকে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার করে দিয়েছেন। এখন আর এতে কোনো দ্বিধা বা সংশয় বাকি নেই। গোটা আলোচনাটির সারমর্ম হল—রাজনীতি ও রাষ্ট্রশাসনে দীনের কোনো ভূমিকা নেই—এই প্রান্তিক চিন্তাটি যেমন সঠিক নয়, দীনের মূল উদ্দেশ্যই হল শাসন ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা—এই ধারণাও শুদ্ধ নয়। বরং সত্য হল—দীনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বান্দা ও আল্লাহ তায়ালার মাঝে মজবুত একটি সম্পর্ক সৃষ্টি করা, যেটি দৃশ্যমান হবে ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে। রাজনীতি এবং শাসনও মূলত এই লক্ষ্যটি অর্জনের একটি মাধ্যমমাত্র; নিজে সরাসরি লক্ষ্য নয়, দীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যও এর ওপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং, ইসলামের দৃষ্টিতে সে রাজনীতিটিই কাঙ্ক্ষিত, যা মূল লক্ষ্য অর্জনের পথে শক্তিবর্ধক ও সাহায্যকারী হয়। কিন্তু তা না হয়ে যদি উলটো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং এর জন্য মূল বিষয়গুলোকে কাটছাঁট করা শুরু হয়ে যায়, তাহলে এমন রাজনীতির সাথে ইসলামের নামটি শতবার জুড়ে দিলেও তাকে ইসলামি রাজনীতি বলা যাবে না।

দুই. ইসলামের শাসনব্যবস্থা

মধ্যযুগে ইউরোপে ব্যক্তিশাসনের যে ব্যাপক প্রচলন ছিল, তা ছিল নিরঙ্কুশ বাদশাহি। সে সময় রাজার কথাই ছিল আইন। তার কথার ন্যায়-অন্যায় যাচাই করার মতো কোনো শক্তি ছিল না, কোনো কর্তৃপক্ষও ছিল না। ফলে রাজা ছিল সব ধরনের জবাবদিহিতামুক্ত যাচ্ছেতাই করতে পারা স্বাধীন মানুষ। লাগামহীন এই রাজত্বের ফলে তখনকার সমাজে জুলুম নিপীড়ন ও ইনসাফহীনতার প্রবল এক স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। ইউরোপে একসময় এর বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিক্রিয়া ও গণপ্রতিরোধ দেখা দিল। সেখান থেকে মানুষের মনে মূল ব্যক্তিশাসন পদ্ধতিটির প্রতিই তৈরি হল নিরঙ্কুশ অসমর্থন ও ঘৃণা। একসময় অবসান হল ব্যক্তিশাসনের। বিকল্প শাসনব্যবস্থা হিসেবে সামনে এল গণতন্ত্র। এই ব্যবস্থাটি ধীরে ধীরে বিভিন্ন দেশে নিজের আসনটি পোক্ত করে বিশ্বজুড়ে এমন এক ফ্যাশনেবল, অপরাজেয় ও অবিকল্প পদ্ধতি হয়ে উঠল যে, এখন ন্যায়-ইনসাফ, সত্যতা ও সততার জিম্মাদার হিসেবে এর বাইরে আর কিছুর কথা মানুষ চিন্তাই করতে পারে না। বিগত হিজরি শতকের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যতগুলো রাজনৈতিক দল ও আন্দোলন গড়ে উঠেছে, সবগুলোতেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কালেমা তাইয়িবার মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে বলা মানেই যেন ইনসাফের বিরুদ্ধে বলা। নাউজুবিল্লাহ।

দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে পড়া এই প্রোপাগান্ডার ফল হল এই—সমকালে যতগুলো রাজনৈতিক দল ইসলামের নাম নিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদেরও বেশির ভাগ নিজেদের রাজনীতিতে গণতন্ত্রকে শুধু শর্তহীন একটি মূলনীতিরূপেই গ্রহণ করেনি; বরং নিজেদের আন্দোলনের শেষ মনজিল হিসেবেও বিবেচনা করেছে এবং নিজেদের সংগঠনগুলোকেও সাজিয়েছে গণতন্ত্রের কাঠামোতেই।

এ প্রবণতা থেকেই খুব জোরালোভাবে একটি দাবি উঠল—গণতন্ত্র পরিপূর্ণরূপে ইসলামসম্মত; বরং, ইসলাম মূলত গণতন্ত্রের শিক্ষাই প্রদান করে। যারা একটু বেশি সতর্ক, তারা সাথে শুধু এটুকু বলে দিলেন—ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের সাংঘর্ষিক অংশগুলো আমরা মানি না। সুতরাং, আমাদের গণতন্ত্র পরিপূর্ণ ইসলামি গণতন্ত্র।

এ ধারণাগুলো আমাদের সময়ে এত বেশি প্রচারিত হয়েছে, যার কারণে এর বিপরীতে গিয়ে কিছু বলা বা চিন্তা করার মানে হল পুরো দুনিয়ার নিন্দা ও তিরস্কারের ঝাড় নিজের দিকে টেনে আনা। গণতন্ত্রের এই উত্তাল সময়ে ঘটনাক্রমে কেউ যদি ব্যক্তিশাসনের পক্ষে টু শব্দটি করে বসে, তাহলে তো আর রক্ষা নাই। তার সাথে এমন আচরণ করা হবে, যেনবা সে ভয়ংকর কোনো কুফরি বাক্য বলে ফেলেছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যাকে আপন দীনের দাওয়াত ও সংস্কার কাজে নির্বাচন করেছেন, তিনি

স্বীয় দায়িত্ব পালনে কাউকে পরোয়া করেন না, প্রভাবিত হন না কোনো মোহনীয় স্লোগানে, এমনকি দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হওয়া উল্লসিত জিন্দাবাদে ভীতও হন না। আপন চিন্তা ও আদর্শে নিষ্কম্প থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করে যান।

ফলে, হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রহ. এক মুহূর্তের জন্যও কবুল করেননি—ইসলাম গণতন্ত্রের তালিম দেয়, বা গণতন্ত্র সর্বোতভাবে ইসলামসম্মত একটি শাসনব্যবস্থা; বরং, বিভিন্ন আলোচনা ও বইপত্রের মধ্যে গণতন্ত্রের ওপর অত্যন্ত শক্তিশালী আপত্তি উঠিয়েছেন এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এর সমস্যা ও সংকটগুলো ব্যাখ্যা করে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন।

মানুষ সাধারণত গণতন্ত্রের গভীরে গিয়ে বিস্তারিতভাবে একে যাচাই করে না; ওপর থেকে শুধু ভাসাভাসা দৃষ্টিতে অত্যন্ত চমৎকার ও মোহনীয়রূপে কল্পনা করে এর পক্ষে অবস্থান নেয়। তারা মনে করে গণতন্ত্র মানে শুধু এটুকু যে, এটি এমন এক পদ্ধতি, যা লাগামহীন একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে এবং শাসকদের কঠোর জবাবদিহিতার আওতায় এনে এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক বেপরোয়া বাদশাহি ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিহত করেছে। এই কল্পনা মাথায় নিয়ে তারা যখন ইসলামি শাসনব্যবস্থার দিকে তাকায়,

দেখে, এখানে শাসনের ক্ষেত্রে সম্মিলিত পরামর্শ বা শুরাব্যবস্থার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে বলে ওঠে, গণতন্ত্র তো সরাসরি ইসলামেরই শিক্ষা। ইসলাম নিজেই তো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন পরিচালনার কথা বলেছে। অথচ, বাস্তবে বিষয়টি এতটা সরল নয়। গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির পেছনে সম্পূর্ণ আলাদা একটি দর্শন কাজ করে, যা ইসলামের সাথে এক কদম চলতেও সক্ষম নয়। এবং এই দর্শনটির কারণে গণতন্ত্র মানতে হলে অনেকটা আবশ্যকীয়ভাবেই সেক্যুলারিজমের ওপর ইমান আনতে হবে। গণতন্ত্রের প্রকৃত মর্ম প্রকাশ করার জন্য খুব প্রসিদ্ধ একটি উক্তি আছে : It is a government of the people, by the people, for the people. অর্থাৎ, গণতন্ত্র জনগণের শাসনের নাম, যা জনগণের দ্বারা জনগণের কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

এজন্য গণতন্ত্রের সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বড় মূল কথাটি হচ্ছে—এতে জনগণকে সর্বোচ্চ বিচারক হিসেবে কল্পনা করা হয় এবং সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে গৃহীত জনগণের সকল ফয়সালা অলঙ্ঘনীয় ও অমোচনীয় হিসেবে মান্য করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তটির সামনে কোনোভাবে কোনোরকমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার উপায় নেই। সংবিধান যদি গণপ্রতিনিধিদের আইন প্রণয়ণের ব্যাপারে কোনো শর্ত জুড়ে দেয়, যেমন : কুরআন-

সুন্নাহ বা জনগণের মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধে আইন তৈরি করা নিষেধ, সবাইকে তা মেনে চলতে হবে বটে; কিন্তু তা এজন্য নয় যে, জনগণের চেয়ে শক্তিশালী কোনো অথরিটি এ শর্তটি করেছে, বা এটি আল্লাহ তায়ালার হুকুম; বরং এখানেও জনগণকেই সর্বোচ্চ শক্তি হিসেবে মানা হয়। কারণ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি সংবিধান গ্রহণযোগ্য হয় জনগণের সমর্থনেই। ফলে, জনগণ চাইলে যেকোনো সময় শর্তটিকে বিলুপ্ত করে দিতে পারে। শেষ পর্যন্ত মূল কথাটি দাঁড়াল—গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণই সব। বিধান প্রণয়ণের ক্ষেত্রে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আল্লাহ তায়ালার জায়গায় অধিষ্ঠিত করা হয়। তারাই হল সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ, যাদের কোনো সিদ্ধান্ত এড়িয়ে যাওয়া যায় না, রদও করা যায় না। নাউজুবিল্লাহ।

এর ওপর ভিত্তি করেই পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রতিনিয়ত নিকৃষ্টতর অনেক আইন জারি করা হচ্ছে। এখনো চলছে এই ধারা। জিনার মতো পাপকর্ম থেকে নিয়ে সমকামিতার মতো ঘৃণিত বিষয় পর্যন্ত এর হাত ধরে বৈধতা পেয়ে যাচ্ছে অবলীলায়। এভাবে এই চিন্তাপদ্ধতিটি পৃথিবীকে চারিত্রিক অধঃপতনের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছে দিয়েছে।

হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি রহ. সংখ্যাগরিষ্ঠতা-নির্ভর এই গণতান্ত্রিক দর্শনের ব্যাপারে বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছেন এবং অত্যন্ত

শক্তিশালী ও প্রাঞ্জল ভাষায় এর ফাঁকি ও ভঙ্গুরতাগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله.

(হে রাসুল) আপনি যদি পৃথিবীবাসীর অধিকাংশের মত অনুসরণ করেন, তাহলে তো তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

অধিকাংশের মতকেই সত্যের মাপকাঠি মান্য করার বিরুদ্ধে এর চেয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা আর কী হতে পারে? কিন্তু দুঃখজনক হল—পৃথিবীব্যাপী ছেয়ে যাওয়া এই বিভ্রমে ভীত হয়ে মুসলমানদের মধ্যেও এই চিন্তা শক্তিশালী হয়ে গেছে—যেদিকে বেশির ভাগ মানুষের সমর্থন থাকবে, তা নিশ্চয়ই সত্য হবে। হাকিমুল উম্মত রহ. নিজের বইপত্র ও বিভিন্ন আলোচনায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া এই বিভ্রান্তিটিকে শক্তভাবে প্রতিরোধ করেছেন।

এক আলোচনায় বলেন, আজকাল খুবই অদ্ভুত একটি চিন্তা গড়ে উঠেছে—যেদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত থাকবে, তার সত্যতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বন্ধুগণ, এটা একটা পর্যায় পর্যন্ত সত্য। কিন্তু এটাও মাথায় রাখতে হবে—মত দ্বারা কার মত উদ্দেশ্য? সেসব সাধারণ মানুষদের, যারা নিতান্ত নির্বোধ? যদি তাদের মতই উদ্দেশ্য হত, তাহলে হজরত হুদ আ.

নিজ গোত্রের মতামত আমলে নিলেন না কেন? গোত্রের সবাই একদিকে ছিল, আর হুদ আ. সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কেন তাওহিদ পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজা মেনে নিলেন না? উলটো গোত্রকে বিভক্ত করার অপবাদ কেন মাথায় পেতে নিলেন? তা তো এজন্যই যে, এই গোত্রের লোকজন মূর্খ ও নির্বোধ ছিল এবং তাদের মতামতও ছিল নিরেট মূর্খতাপূর্ণ।[2]

বোঝাতে চেয়েছেন—সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় কখনো শুদ্ধতার পরিমাপক হতে পারে না। কারণ, সাধারণ মানুষের বেশির ভাগই হয় অজ্ঞ, না হয় কম জ্ঞানের অধিকারী।

হাকিমুল উম্মত রহ. অন্য এক জায়গায় বলেন, মাওলানা হুসাইন এলাহাবাদি একবার সাইয়েদ আহমদ খানকে বললেন—আপনারা যারা অধিকাংশের মত অনুযায়ী ফয়সালা করেন, তারা ফয়সালা করেন মূলত বোকামির ভিত্তিতে। কারণ, প্রকৃতির নিয়ম হল দুনিয়ার মধ্যে বুদ্ধিমান মানুষের সংখ্যা হয় কম এবং বেকুব মানুষ হয় বেশি। সুতরাং বেশি মানুষের মত মানে মূর্খতাপ্রসূত মত।

অন্য আরেক জায়গায় বলেন, উহুদ যুদ্ধে পাহাড়ি ঘাঁটিতে নিয়োজিত সেই পঞ্চাশজন সাহাবির মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিল। কেউ বললেন, যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে। সুতরাং, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে পাহারায়

থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে নির্দেশও সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখন যদি আমরা চলে যাই, তাহলে নির্দেশ অমান্য করা হবে না, এ কাজ তাঁর উদ্দেশ্যের পরিপন্থিও হবে না। তাই এখন আর এখানে বসে থাকার কোনো অর্থ নেই। এদিকে এখন পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে সরাসরি কোনো কাজে অংশ নিতে পারিনি; কিন্তু আমাদেরও তো কিছু করা দরকার। সাথিরা কাফেরদের ধাওয়া করে নিয়ে যাচ্ছে, এ সুযোগে আমরা গনিমতের মালগুলো জমা করে ফেলি; কিন্তু অপর কয়েকজন এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলেন এবং বললেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আমার অনুমতি ছাড়া তোমরা এখান থেকে নড়বে না। তাই নবিজির নির্দেশ না পেলে এখান থেকে নড়াটা মোটেও ঠিক হবে না।

প্রথম মতের লোকজন এ যুক্তি মানলেন না। চল্লিশজন সাহাবি ঘাঁটি ছেড়ে ময়দানে গনিমতের মাল সংগ্রহে মশগুল হয়ে পড়লেন। এটা তাদের বোঝার ভুল ছিল। ঘাঁটিতে রয়ে গেছেন মাত্র দশজন সৈনিক সাহাবি ও একজন কমান্ডার।

এই ঘটনায় সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় ভুল ছিল; সঠিক ছিল কমসংখ্যক লোকদের মতামতটিই। যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতকে সঠিক হওয়ার আলামত মনে করেন, এই ঘটনাটি থেকে তারা শিক্ষা নিতে পারেন।

এই আলোচনাতেই আরেকটু সামনে এগিয়ে গিয়ে অধিকাংশ মানুষের সিদ্ধান্ত আবশ্যকীয়ভাবে সঠিক

হওয়ার চিন্তা রদ করে আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর ঘটনাটি উদাহরণ হিসেবে পেশ করেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরপর যখন কিছু গোত্র জাকাত দিতে অস্বীকার করল, তাদের বিরুদ্ধে তিনি সরাসরি জিহাদের ঘোষণা দিলেন। কিন্তু উমর রা.-সহ বেশির ভাগ সাহাবির অবস্থান ছিল তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ না করার পক্ষে। কিন্তু আবু বকর রা. আপন মতামতের ওপর অটল রইলেন এবং শেষ পর্যন্ত জিহাদের অভিযান চালানো হল। পরবর্তী সময়ে সকলেই স্বীকার করেছেন, খলিফা আবু বকরের সিদ্ধান্তটিই ছিল সঠিক।

থানবি রহ. অধিকাংশের মতকে সত্যের মাপকাঠি মনে করার চিন্তাটিকে স্বভাবজাত যুক্তি ও শরিয়তের দলিলের আলোকে এত শক্তিশালী ও প্রাঞ্জল ভাষায় সমালোচনা করেছেন এবং এর ক্ষতি ও বিভ্রান্তির দিকগুলো উন্মোচিত করেছেন, ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে যে কেউ শেষ পর্যন্ত তাঁর মতো একই ফলাফলে উপনীত হবে।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সত্যান্বেষী অনেক গবেষক গণতন্ত্রের এই ত্রুটিগুলো মেনে নিয়েছেন। প্রসিদ্ধ রাজনীতি বিশেষজ্ঞ এডমান্ড বার্ক লেখেন—সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি মানুষের স্বভাবজাত কোনো বিধান নয়। কারণ, কমসংখ্যক লোক অনেক সময় বেশি মজবুত

ও শক্তিশালী মত ধারণ করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের লোভ-লালসার মোকাবেলায় তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বেশি হতে পারে। সুতরাং, যেটা বলা হয়—সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী আইন হওয়া উচিত, এর সত্য ও সততা যেমন কম, তেমনই কম কল্যাণ ও পলিসিগত ন্যায্যতা।[3]

হাকিমুল উম্মত রহ. অন্য আরেক আলোচনায় বলেন—প্রথম কথা হল, সংখ্যাগরিষ্ঠের মত তৈরি করার সময় বোকা লোকদের একত্র করা হয়, ফলে, তারা সবাই বোকামিপূর্ণ সিদ্ধান্তই দেবে, এর ওপর আবার মতামতটিও তাদের স্বাধীনভাবে দিতে দেওয়া হয় না। আগে থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে আনা হয়—আমরা এই প্রস্তাব করব, তোমরা এই মতামত দেবে; যেমন করে উকিল জপিয়ে আনে সাক্ষীকে। এই গণতন্ত্র দিয়ে কী ছাইটা হবে!

গণতন্ত্রপন্থি অনেকে থানবি রহ.-এর পর্যালোচনাটি গভীর থেকে বুঝতে পারেন না। এ কারণে মন্তব্য করে বসেন—এটি নিছকই একটি অগভীর ও ভাসাভাসা বিশ্লেষণ।

কেউ কেউ তো এমনও বলেন, এটা এমন এক মুরুব্বির বিশ্লেষণ, রাজনীতি যার বিষয় ছিল না, রাজনীতি তিনি বুঝতেনও না। কিন্তু তারা জানে না, ধীমান এই মানুষটি নিজের ঘরের কোনায় বসে থাকলেও তার প্রখর দৃষ্টি প্রসারিত ছিল আপন সময়ের শিরা-উপশিরায়। তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মূল

উৎস ছিল কুরআন ও সুন্নাহ। এ জ্ঞান তাকে গভীর এক অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিল। এ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মানুষ যেগুলোকে রীতিমতো গুরুগম্ভীর দর্শন বানিয়ে ফেলেছে, সেগুলোকেও অত্যন্ত সাদামাটা ভাষায় তুলে ধরতে পারতেন। গণতন্ত্র-সম্পর্কিত তার এই পর্যালোচনাও ছিল সেই ইমানি অন্তর্দৃষ্টির ফলাফল। রাজনীতি-জ্ঞান নিশ্চয়ই তাঁর বিষয় ছিল না; কিন্তু যার হৃদয় ও মস্তিষ্ক অহির নুরে উদ্ভাসিত হয়, তার জন্য প্রথাগত জ্ঞানের দরকার পড়ে না।

কিন্তু যে সকল রাজনীতি বিশেষজ্ঞ প্রোপাগান্ডার জাল থেকে মুক্ত হয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করেছেন, তারা শেষ পর্যন্ত এই ফলাফলে এসেই উপনীত হয়েছেন।

ড. এ আপোদ রায় ভারত উপমহাদেশে রাজনীতিবিষয়ক বইপত্র লিখে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি গণতন্ত্রের পরিচয় ও এর সফলতার জন্য শর্তসমূহ আলোচনা করার পর বলেছেন—

গণতন্ত্রের ইতিহাস বলে, গণতন্ত্রের সফলতার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে, এগুলো সবসময় কেতাবেই রয়ে গেছে; বাস্তবে কোথাও কখনো বাস্তবায়ন হয়নি বললেই চলে। বাস্তব জীবনে আমরা দেখেছি গণতন্ত্র মূলত মূর্খদের শাসন। এতে শুধুই পরিমাণ ও সংখ্যা আমলে নেওয়া হয়; গুণগত মান সবসময় উপেক্ষিতই থেকে যায়। ভোট শুধু গণনাই করা হয়; ওজন করা হয় না। বেশির ভাগ নাগরিক এখনো রাষ্ট্রশাসনকে

নিজের জীবনের মৌলিক কোনো দায়িত্ব বলে মনে করে না, ফলে, শাসনের প্রতি তাদের বিশেষ কোনো আগ্রহও নেই। তারা সবসময় নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যে যে পেশা ও শিল্পে আছে, সে তা নিয়েই দিনরাত মশগুল। হাল চাষ করে, বীজ বোনে, ফসল কাটে, সেগুলো বাজারে বিক্রি করে। সময় সুযোগমতো কিছু বিনোদন-টিনোদন করে। তাদের পুরো জীবনচক্রটি এভাবেই আবর্তিত হয়। সেখানে রাষ্ট্র পরিচালনা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই, তারা নিজেদের দেশের শাসক বলেও মনে করে না; অথচ, কেতাবি ভাষায় বলার সময় আমরা বলছি—গণতন্ত্র হল জনগণের শাসন!

নির্বাচনের সময় যে বিষয়গুলো মাথায় রেখে ভোট দিতে হয়, সেগুলো বুঝে ওঠার মতো চিন্তাগত পরিপক্কতা মানুষের হয় না। গণতেন্ত্রর মধ্যে এই সমস্যাটি একটি বাস্তব সমস্যা। একে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। মানুষ দলান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, স্লোগান আর ইশতেহারে অন্ধ হয়ে যায়। স্যার হেনরি তো এ পর্যন্ত বলেছেন—গণতন্ত্র কোনোভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয়। কারণ, প্রাকৃতিক নিয়ম হল সাধারণ মানুষ সবসময় নিজের নেতার সিদ্ধান্তগুলোই চোখ বন্ধ করে মেনে নেয়।[4]

পশ্চিমের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক কার্লাইল-এর কথাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে খুবই প্রসিদ্ধ :

জ্ঞানী লোকেরা নির্বোধ অশিক্ষিত লোকদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে এবং বুঝিয়ে সমঝিয়ে হোক বা বলপ্রয়োগ করে, তাদের সরল পথে পরিচালিত করবে। এটা নির্বোধ মানুষদের মানবিক অধিকার। নিশ্চিত করেই বলা যায় আমাদের মধ্যে এটি সবচেয়ে নির্বিরোধ একটি বিষয়। প্রকৃতির নিয়মটি শুরু থেকেই এমন। এ নিয়ম কার্যকর করে এবং যথাসম্ভব পূর্ণতা দেওয়ার মাধ্যমেই কেবল একটি সমাজ উন্নতি ও উৎকর্ষতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও দেখব রোম ও এথেন্স ছিল তৎকালে সভ্য ও উন্নত জাতি। কিন্তু অন্যান্য জায়গার মতো সেখানে এ ধরনের ভোটাভোটির রেওয়াজ ছিল না। ছিল না গুণগত দিক দিয়ে কোনো ধরনের যাচাইবাছাই ছাড়া বিশালসংখ্যক গণপ্রতিনিধির সম্মিলিত শলাপরামর্শ; বরং তাদের সমাজটি পরিচালিত হত খুব বাছাই করা শিক্ষিত ও জ্ঞানী কিছু মানুষের পরামর্শ মোতাবেক। এটিই পৃথিবীর প্রাচীনতম নিয়ম। এ নিয়ম সবসময় সত্য ছিল, ভবিষ্যতেও সত্যই থাকবে।[5]

ব্যক্তিশাসন

হাকিমুল উম্মত রহ. গণতন্ত্রের ভঙ্গুরতাগুলো দেখিয়ে বেশ কিছু জায়গায় এক ব্যক্তিশাসনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সমকালের এই গণতন্ত্র পূজার

সময়ে ব্যক্তিশাসনের পক্ষে বলা তো রীতিমতো কুফরি কথা বলার মতো অপরাধ। তিরস্কারের বন্যা বয়ে যাবে। এর কারণ দুটি :

এক. গণতন্ত্রের পক্ষে এত জোরালো প্রোপাগান্ডা চালিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করা হয়েছে যে, এরপর আর ঠান্ডা মাথায় ভিন্ন কোনো শাসনব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে তারা মানসিকভাবেই প্রস্তুত নয়।

দুই. ব্যক্তিশাসনের কথা বললে আমাদের মনে পড়ে যায় সেসব রাজা-বাদশার শাসন, যাদের মুখের কথাই ছিল আইন। যারা যা ইচ্ছা তা-ই করত, তাদের বিরোধিতা করার মতো কেউ ছিল না, এমনকি বিপরীত কিছু বলার সাহসও কারও ছিল না। অথবা মনে পড়ে সেসব নিষ্ঠুর স্বৈরশাসকের কথা, যারা নিজেদের একচেটিয়া শাসন টিকিয়ে রেখেছিল নিছক ক্ষমতার জোরে।

অথচ ব্যক্তিশাসন বলতে হাকিমুল উম্মত রহ. এখানে বোঝাচ্ছেন সেসব ইসলামি শাসকের কথা, যারা ছিলেন পৃথিবীর আদর্শ এবং যাদের শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে আমিরুল মুমিনিন বা খলিফা বলে ডাকা হয়।

আরেকটু খুলে বললে, পৃথিবীতে ইসলামবহির্ভূত যতগুলো একনায়কতন্ত্র ছিল, সবগুলো খারাপ হওয়ার মূল কারণ ছিল :

1. এ শাসনগুলো স্রেফ খানদানি উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রাজার ছেলেই হয়েছে রাজা। স্বৈরাচাররা টিকেছিল শুধুমাত্র ক্ষমতার জোর দেখিয়ে। এদের মূল দর্শন ছিল— শক্তিশালীরা দুর্বলদের শাসন করার অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। এগুলোর প্রতিষ্ঠার পেছনে না ছিল সুস্থির চিন্তাভাবনার অবকাশ, না ছিল যোগ্য-অযোগ্য বাছাইয়ের সামান্য সুযোগ।

2. শাসনক্ষমতা লাভের জন্য এদের যোগ্যতার কোনো শর্ত ছিল না। ছিল না শাসনের জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলির কোনো বালাই।
3. এরা ঐশী কোনো বিধানও মেনে চলত না। ফলে, কোনো কিছুর পরোয়া ছিল না তাদের। নিজেরাই আইনপ্রণেতা ছিল না। কোনো নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা না থাকার কারণে মুখে যা বলত তা-ই আইনে পরিণত হত।
4. তাদের সময়ে রাষ্ট্রে এমন কোনো কর্তৃপক্ষ বা পরিষদ ছিল না, যে তাদের নানা পদক্ষেপ ও আইনকানুন চ্যালেঞ্জ করতে পারে, খোদায়ি আইনের বিরুদ্ধে গেলে ব্যবস্থা নিতে পারে, কিংবা সীমালঙ্ঘন করে কোনো জুলুম করলে প্রতিকার করতে পারে।

এই বিষয়গুলোর কারণেই তখনকার ব্যক্তিশাসন এতটা নিকৃষ্ট হয়েছিল। সাধারণ জনগণ জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হত, মানুষের অধিকার ভুলুণ্ঠিত হত। আর না হয় বেশির ভাগ রাজনীতি বিশেষজ্ঞ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে ব্যক্তিশাসন মৌলিকভাবে খারাপ নয়। গণতন্ত্রের পরিবর্তে এটি অনেক বেশি সফল এবং জনবান্ধব হতে পারে। এমনকি রুশো পর্যন্ত এ কথা স্বীকার করেছেন—'শাসনের জন্য সবচেয়ে ভালো ও স্বভাবজাত পদ্ধতি হল দেশের সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষটি শাসক হয়ে দেশ পরিচালনা করবেন। তবে, শর্ত একটাই—তিনি জনগণের জন্য দেশ চালাবেন; নিজের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নয়—এ বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে।'[6]

কার্লাইল লিখেছেন—যেকোনো দেশের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে তালাশ করে বের করো, এরপর তাকে শাসক বানিয়ে দাও এবং যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে আনুগত্য করো। এভাবে একটা দেশে একব্যক্তিশাসনপ্রতিষ্ঠা করার পর এর উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য আর কিছু করতে হবে না। ব্যালেট বাক্স, পার্লামেন্টে উচ্চাঙ্গের বক্তব্য, আলোচনা-পর্যালোচনা, মতামত, সংবিধান ইত্যাদি কোনো টেকনিকই সে দেশের শাসনব্যবস্থায় নতুন করে ভালো কিছু যুক্ত করতে পারবে না। সে দেশটির জন্য এক ব্যক্তির শাসনই যথেষ্ট এবং সেটি হবে সবচেয়ে উন্নত এবং সারা পৃথিবীর জন্য আদর্শ এক রাষ্ট্র।

হাকিমুল উম্মত রহ. যে ধরনের ব্যক্তিশাসনকে ইসলামের কাঙ্ক্ষিত শাসনব্যবস্থা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তা হবে ব্যক্তিশাসনের উল্লেখিত মন্দ দিকগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এটি নিঃসন্দেহে ব্যক্তিশাসন; কারণ, এতে গণতন্ত্রের তৈরি পার্লামেন্ট সকল ক্ষমতার মালিক হয় না এবং শাসনসংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত অনেক দূর পর্যন্ত খলিফা বা আমিরুল মুমিনিনের নিজের হাতে থাকে। কিন্তু সে খলিফা স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠার সুযোগ নেই। কেননা, তিনি উত্তরাধিকার বা নিজস্ব ক্ষমতার জোরে শাসক হন না; বরং শরিয়া-নির্দেশিত আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ (বিশেষ পাওয়ার কমিটি) তাকে নির্বাচিত করেন। তবে এই কমিটি ইচ্ছেমতো যে কাউকে নির্বাচন করার অধিকার রাখে না। তার মধ্যে আবশ্যকীয় কিছু গুণ থাকতে হয়। এসবের মধ্যে অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা ছাড়াও শাসন চালানোর জন্য উচ্চ পর্যায়ের দক্ষতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তিও অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নেতা নির্বাচনের জন্য সাধারণত কোনো যোগ্যতার শর্ত আরোপ করা হয় না। শর্ত করা হয় না পরিচালনা ও কর্ম সম্পাদনের বিশেষ দক্ষতারও।

বিপরীতে ইসলাম খলিফা নির্বাচনের জন্য অত্যন্ত শক্ত কিছু শর্ত আরোপ করে দিয়েছে। নির্বাচন কমিটির দায়িত্ব হল এ বিষয়গুলো পরিপূর্ণভাবে

নিশ্চিত করেই একজনকে খলিফা নির্বাচন করা। এটা শরিয়তের পক্ষ থেকে অবশ্যপালনীয় নির্দেশ।

এমন উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি খলিফা হওয়ার পর তিনি যে সম্পূর্ণ স্বাধীন, যাচ্ছেতাই করতে পারবেন—বিষয়টি মোটেও এমন নয়। বরং তাকেও কুরআন-সুন্নাহ-ইজমা এসবের আনুগত্য করতে হবে। অন্যভাবে বললে—ইসলামি হুকুমত নিজে কোনো আইন প্রণয়ন করে না; বরং এমন এক ঐশী বিধানের ভিত্তিতে অস্তিত্ব লাভ করে ও একেই কার্যকর করে, যা বিশ্বজগতের সবচেয়ে উন্নত ও শক্তিধর অথরিটি কর্তৃক প্রণীত এবং যা কুরআন-সুন্নাহরূপে সংরক্ষিত। অবশ্য, কুরআন-সুন্নাহর বেঁধে দেওয়া সীমানায় থেকে ব্যবস্থাপনাগত বিভিন্ন আইন জারি করতে পারে। এ ক্ষেত্রেও খলিফাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কোনো আইন জারি করার আগে তিনি যেন বিশেষ শুরা কমিটির সাথে পরামর্শ করে নেন। এ পরামর্শ এজন্য নয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত মেনে সে অনুযায়ী চলবেন; বরং এর উদ্দেশ্য হল একটি বিষয়ের সবগুলো দিক যেন সামনে আসে, ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পান এবং আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করে সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্তটি তিনি গ্রহণ করতে পারেন।

এ ছাড়া যেহেতু খলিফার সকল আইনকানুন, পদক্ষেপ ও সমস্ত নির্দেশ কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক হওয়া জরুরি, তাই কখনো যদি তিনি শরিয়ত লঙ্ঘন

করে জুলুম শুরু করেন, তাহলে কোর্টে মামলা করে কাজির সহায়তায় যেকোনো সাধারণ নাগরিকও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। নাগরিকদের এ অধিকারটি কখনো রহিত হওয়ার নয়।

ইসলামি শাসনব্যবস্থার খুঁটিনাটি সকল কিছু বর্ণনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু এটুকু দেখাতে চেয়েছি—হাকিমুল উম্মত রহ. যে ব্যক্তিশাসনের কথা বলেছেন, তা প্রাচীন রাজা-বাদশা, হালের স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদী শাসকদের মতো নয়। এতে সেই মন্দ দিকগুলো নেই, যেগুলোর কারণে এই শাসনটি ঘৃণিত ও নিন্দিত হয়েছিল।

হাকিমুল উম্মত রহ. গণতন্ত্র ও ব্যক্তিশাসনের তুলনামূলক আলোচনাটি বিভিন্ন জায়গায় করেছেন, তবে বোধ করি সবচেয়ে বেশি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এই বয়ানটিতে। বয়ানটি *তাকলিলুল ইখতিলাত মাআল আনাম* নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সেখান থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ উল্লেখ করছি :

সত্য কথা হল, যে লোক গণতান্ত্রিক শাসনের পক্ষে সে-ও মূলত ব্যক্তিশাসনেরই পক্ষে; তবে ব্যক্তিসত্তা কখনো আক্ষরিক হয়, কখনো হয় ধারণাগত। দর্শন বলে—সমষ্টিও মূলত এককের পর্যায়ে। কিন্তু সে একক বাস্তবে নয়, ধারণাগত। ফলে, এই লোক যে পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে তাতে বাহ্যত অনেক মানুষ অংশীদার হলেও

সামষ্টিকভাবে এটি মূলত একক একটি সত্তাই। কেননা, যে আইন পাশ হয় তা সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতেই পাশ হয়। পার্লামেন্টেও সকলে স্বাধীন নয় যে, সে যা বলবে তা-ই পাশ হবে। অন্তত এমনটি হলেও বলা যেত তার কথা কিছুটা সঠিক। কিন্তু পার্লামেন্টে তো প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। সবাই মিলে যে সিদ্ধান্তে একমত হয়, কেবল সেটিই গ্রহণযোগ্য, এবং আমরা জানি সম্মিলিত মতামত মূলত ব্যক্তি বিশেষের একক মতামতের মতই। কারণ, আগেই বলেছি, দর্শনের মতে সমষ্টি মিলে ধারণাগতভাবে এককে পরিণত হয়।

ফলাফল কী হল? আমরা সত্যিকারের একব্যক্তিশাসনের পক্ষে, আর আপনারা পক্ষ নিয়েছেন ধারণাগত একনায়কতন্ত্রের। ফলে, গণতন্ত্রের ধারক তো আপনারাও নন। গণতন্ত্র ও পূর্ণ স্বাধীনতা তো তখনই হবে, যখন প্রতিটি মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছা তা করতে পারবে। কেউ কারও অনুগত হবে না—না এক ব্যক্তির, না সংসদের দশজন নেতার।

এ কেমন স্বাধীনতা যে আপনারা লক্ষ-কোটি মানুষকে পার্লামেন্টের দশজন মেম্বারের অনুগত বানিয়ে দিলেন! অথচ আমরা তো বলছি শুধুমাত্র একজনের আনুগত্য করার কথা। আপনারাই বলুন, কোনটি ভালো? একজনের অনুসরণ করা, নাকি একই সাথে দশ-বিশ জনের? এটি একদমই সহজ

হিসাব—যাকে শুধুমাত্র একজনে চালায়, সে ওই ব্যক্তির চেয়ে ভালো আছে, যাকে চালায় একশজন।

সৃষ্টিকুলের কিছু সদস্য অপর কিছু সদস্যের অনুসরণ করে চলবে, এ ছাড়া জগতের শৃঙ্খলাই তৈরি হবে না। লাগামহীন স্বাধীনতা অনিশ্চয়তাই বাড়ায় শুধু। তাই এই জায়গাটিতে এসে তাদের নিজেদের স্বাধীনতার দাবিটি থেকে পিছু না হটে উপায় নেই। কিন্তু শরিয়ত সবসময় আপন সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারে। কখনো কোনো পরিস্থিতিতেই নতি স্বীকার করে পিছু হটতে হয় না। কারণ, সে তো পূর্ব থেকেই অনুসরণ-নীতির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। স্বাধীনতার বেয়াড়া সবক শেখায়ই না। প্রথম দিন থেকেই নবিজির আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে সমস্ত সৃষ্টিকে একজনের অনুগামী করে দিয়েছে।

শুধু তাই নয়, কখনো যদি আল্লাহ তায়ালা কোনো গোত্রের নিকট একই সময়ে দুজন নবি পাঠিয়েছেন, দেখা গেছে সেখানেও একজনকে অপরজনের অনুগামী করে দিয়েছেন। আমরা দেখি, হজরত মুসা ও হারুন আ. একই সময়ে দুজন নবি ছিলেন। তারা বনি ইসরাইল ও কিবত জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু দুজনকে আল্লাহ একই স্তরে রাখেননি। মুসা আ. ছিলেন অনুসৃত আর হারুন আ. তাঁর অনুগামী। এবং এই আনুগত্য শুধু কথার কথা হিসেবে ছিল না, বাস্তবেও মুসা আ. হারুন আ.-এর

ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখতেন। হারুন আ.-এর পক্ষে তার কোনো নির্দেশ অমান্য করার সুযোগ ছিল না।

তিনি আরও বলেন—ইসলামে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে কিছু নেই। ইসলাম শুধু ব্যক্তিশাসনের কথাই বলে। এবং যে ভয়ে গণতন্ত্র বানানো হয়েছে, সেসবের আশঙ্কা ব্যক্তিশাসনের মধ্যেও আছে, কিন্তু গণতন্ত্রের মধ্যে শুধু যে আশঙ্কা এমন নয়, নিশ্চিতভাবেই বিদ্যমান। ব্যক্তিশাসনকে নিন্দা করার বিশেষ একটি বিষয় হল—বলা হয়, এতে এক ব্যক্তি একা একা দেশের সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়। সে যাচ্ছেতাই করতে পারে। অথচ, নানা জায়গায় গিয়ে সে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসতে পারে। এজন্য একজনমাত্র ব্যক্তিকে সকল কিছুর দায়িত্ব না দিয়ে টিমওয়ার্ক হওয়া উচিত। আমি বলব—ব্যক্তিশাসনে বাদশার ভুল হওয়া যেমন সম্ভব তেমনই দলবদ্ধ সিদ্ধান্তেও ভুলের আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, এটা আবশ্যক নয় যে, এক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত সবসময় ভুল হবে এবং দশজনের সিদ্ধান্ত সবসময় সঠিক হবে; বরং অনেক সময়ই এমন হয়—একজনমাত্র ব্যক্তি এমন সব বিষয় বুঝে ফেলে, যা হাজারজন মিলেও ধরতে পারে না। আবিষ্কারজগতে হরদম এমন হচ্ছে। এ পর্যন্ত যতগুলো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে এর বেশির ভাগ এক ব্যক্তির চিন্তার ফসল। একজন একটি বিষয় উদ্ভাবন করেছে তো আরেকজন আরেকটি বিষয়। একজন বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেছে তো অন্য একজন

রেল আবিষ্কার করেছে। দেখা যাচ্ছে আবিষ্কারক বেশির ভাগ সময় একজনই হয় এবং তার চিন্তা সেই জায়গায় গিয়ে উপনীত হয় যেখানে শত হাজার লোকের চিন্তা গিয়ে পৌঁছতে পারেনি। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও এটি ঘটে। দেখা যায় অনেক সময় এক গবেষক কোনো বিষয় এত সুন্দরভাবে সমাধান করেন, যার ফলে অন্য সকল ব্যাখ্যা ও পাদটীকা ভুল প্রমাণিত হয়। সুতরাং, এটা আবশ্যক নয় যে, দলবদ্ধভাবে শাসন চালালেই সবসময় তা সঠিক হবে।

এবার বলুন—যদি কোনো সময় প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত সঠিক হয় এবং পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত ভুল হয়, তাহলে কোনটি মানা হবে? গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয়; শুধুমাত্র প্রেসিডেন্টের মতের ওপর আইন পাশ করা যাবে না; বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে নতি স্বীকার করে তাদের ভুল মতামতের সাথে একাত্ম হতে তিনি বাধ্য। কিন্তু ব্যক্তিশাসনে খলিফা সবসময় নিজের মত অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ পান। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সে সুযোগ নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত ভুল হলেও ইচ্ছা-অনিচ্ছায় এর সাথে একমত হতে সকলে বাধ্য। এটি কত বড় অন্যায়! তাই 'সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে'—এই মূলনীতিটিই ভুল। মূলনীতি হওয়া উচিত এমন—সিদ্ধান্ত হবে সঠিক মত অনুযায়ী, তা এক ব্যক্তির মতামত হলেও।

সামনে গিয়ে আরও বলেন—অন্য যারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে মূলনীতি বানিয়েছে, তারা শাসককে একা সিদ্ধান্ত নিতে দেয় না। প্রথম থেকেই ধরে নিয়েছে আমাদের শাসক এমন দুর্বল, একা সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো যোগ্যতাই তার নেই। তো যারা নিজেদের শাসককে এমন দুর্বল আর অযোগ্য মনে করে, তাদের নিয়ে আমাদের কোনো কথা নেই। তাদের সে গণতন্ত্র মোবারক হোক। এমন অযোগ্য লোক কখনোই একা দেশ চালাতে পারবে না। ইসলাম যে ব্যক্তিশাসনের শিক্ষা দেয় তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে ব্যক্তিশাসনের কথা বলে সাথে এ-ও বলে দেওয়া হয়—হে নির্বাচক শুরা কমিটি, হে বুদ্ধিমান লোকেরা! এমন একজনকে শাসক বানাও, যে এ পরিমাণ ধীশক্তির অধিকারী হবে, কখনো তার সিদ্ধান্তের বিপরীতে পুরো পৃথিবী চলে গেলেও যেন তার মতটি সঠিক হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যার মধ্যে এতটুকু যোগ্যতা থাকবে না, তাকে শাসক বানানোর প্রয়োজন নেই। যার মতামত এমন মজবুত হয়, সে একা দেশ চালানোর যোগ্য কি না? নিশ্চয়ই যোগ্য। শর্ত হল শুরা কমিটি নির্বাচনের সময় খেয়ানত করতে পারবে না। তো, আমরা ব্যক্তিশাসনের কথা বলছি, কারণ, নিজেদের শাসককে অসম্ভব বুদ্ধিমান ও অসাধারণ এক বিবেচক মানুষ মনে করি। আর আপনারা গণতন্ত্রের কথা বলেন, কারণ নিজেদের শাসকের ওপর ভরসা করতে পারেন না। তাকে

নিতান্ত দুর্বল ও অযোগ্য মনে করেন। এমন অযোগ্য লোককে শাসক বানানোর দরকারটাই-বা কী, যার পেছনে আবার অনেক তল্পিবাহকের প্রয়োজন পড়ে! বরং প্রথম থেকেই এমন কাউকে দায়িত্ব দিন, যার এমন তল্পিবাহক দলের প্রয়োজন নেই। যিনি হবেন যোগ্য, বুদ্ধিমান ও বিবেচক। যদি বলেন—না, আমরাও নিজেদের শাসককে সবচেয়ে যোগ্য ও বুদ্ধিমানই মনে করি, তাহলে যোগ্যতর একজন লোককে তার চেয়ে কম বুদ্ধির আরও অনেক মানুষের অনুগামী বানিয়ে দেওয়া অন্যায় নয়? এ বরং স্পষ্ট নির্বুদ্ধিতা।

কিছু লোক আরেকটা বোকামি করেন। তারা জোরজবরদস্তি করে গণতন্ত্রকে ইসলামের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলতে চান। দাবি করেন, ইসলাম মূলত গণতন্ত্রের শিক্ষাই দেয়। দলিল হিসেবে নিচের আয়াতটি পেশ করেন : وشاورهم في الامر (হে নবি, আপনি তাদের সাথে কাজেকর্মে পরামর্শ করুন!)

কিন্তু এটি সম্পূর্ণ ভুল। এই লোকগুলো মশওয়ারার মূল বিষয় ও রুহটাকেই নাই করে দিয়েছে এবং ইসলামের দৃষ্টিতে মাশওয়ারা মানে কী, সে জিনিসটিই বোঝেনি। ইসলামে মাশওয়ারার অবস্থান হল—একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারিরা রা.-কে বললেন, তুমি স্বামীর কাছে ফিরে যাও। বারিরা রা. প্রথমে দাসী ছিলেন। সে অবস্থায় তার মুনিব মুগিস নামে একজনের সাথে তার বিয়ে পড়িয়ে দেন। কিন্তু যখন বারিরা রা. আজাদ

হলেন, তখন শরিয়তের বিধি মোতাবেক দাসী অবস্থায় গ্রহণ করা স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখা না-রাখার ইচ্ছাধিকার লাভ করেন। শরিয়তের পরিভাষায় একে ইখতিয়ারে ইতক বা 'স্বাধীনতার সূত্রে প্রাপ্ত ইচ্ছাধিকার' বলা হয়। এ অধিকার পেয়ে বারিরা রা. বিয়ে ভেঙে দিলেন। কিন্তু স্বামী মুগিস তাকে খুব বেশি ভালোবাসতেন। বিচ্ছেদের ব্যথায় তিনি মদিনার অলিগলি ঘুরছিলেন আর কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিলেন। এ অবস্থা দেখে নবিজির খুব মায়া হল। তিনি বারিরা রা.-কে বললেন, বারিরা, তুমি যদি স্বামীকে ফিরিয়ে নিতে! বারিরা রা. তখন জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, এটা কি আপনার নির্দেশ, না পরামর্শ? যদি নির্দেশ হয়, তাহলে যত কষ্টই হোক, সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেব। নবিজি তখন বললেন, নির্দেশ নয়; পরামর্শ শুধু। এ কথা শুনে বারিরা রা. বলেন, যদি পরামর্শই হয়ে থাকে, তাহলে আমি তাকে গ্রহণ করব না।

নিন, এই হল ইসলামে মাশওয়ারা বলতে যা বোঝায় তার প্রকৃত চিত্র—নবি কিংবা খলিফা যদি ভালো মনে করে জনগণের কাউকে কোনো পরামর্শ দেন, তাহলে সে তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখে। শুধু কথার কথা হিসেবে নয়, সত্যিকার অর্থেই এ অধিকারটি তার আছে। এ কারণেই বারিরা রা. যখন নবিজির পরামর্শ গ্রহণ করলেন না, এতে তিনি সামান্য পরিমাণ অসন্তুষ্ট হননি, না মানার কারণে তার

গুনাহও হয়নি এবং তাকে কোনোরূপ তিরস্কারও করা হয়নি।

সুতরাং উম্মতের কোনো সদস্য স্বয়ং নবির পরামর্শ বা জনগণের কেউ খলিফার পরামর্শ মানতে যদি বাধ্য না হয়, তাহলে নবি বা খলিফা জনগণের পরামর্শ মানতে বাধ্য হবেন কী করে! তা-ও যেনতেনভাবে নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ঠিক যেভাবে বলবে, হুবহু সেভাবেই চলতে হবে, কখনো সামান্য ব্যতিক্রমও করা যাবে না।

সুতরাং, وشاورهم في الامر আয়াত দ্বারা শুধু এটুকু প্রমাণিত হয়—শাসক জনগণের সাথে পরামর্শ করবে। কিন্তু এ কীভাবে প্রমাণিত হল যে, সে পরামর্শ মোতাবেক তাকে চলতেই হবে? অধিকাংশের মতামত যদি শাসকের মতের বিপরীতে যায়, তাহলে বিপরীত মতটিই বাস্তবায়ন করতে তিনি বাধ্য?

এটা যতক্ষণ না প্রমাণিত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আয়াতটি দিয়ে কোনোভাবেই গণতন্ত্রের পক্ষে দলিল প্রদান করা যাবে না। এটা অসম্ভব। অবাক করা বিষয়, ইসলামে যেখানে একজন সাধারণ মানুষ বাদশার পরামর্শ মেনে নিতে বাধ্য নয় সেখানে আপনারা স্বয়ং শাসককে জনগণের পরামর্শ মোতাবেক চলতে বাধ্য করেন কীভাবে? বলুন তো শেষ পর্যন্ত এর পক্ষে আসলেই কোনো দলিল আছে? নাকি দাবিমাত্র?

এর বিপরীতে প্রমাণ হিসেবে আমাদের কাছে বারিরা রা.-এর এই ঘটনাটি রয়েছে যে, কারও

পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক নয়, শাসকের পরামর্শ হলেও।

এ থেকে প্রমাণিত হল—যদি শাসক জনগণ থেকে কোনো বিষয়ে পরামর্শ নেন, তা বাস্তবায়ন করতে তিনি বাধ্য নন; বরং কাজ করবেন নিজের সিদ্ধান্ত মোতাবেক, এ সময়ে এমনকি দেশের সব মানুষের পরামর্শটি যদি তার মতের বিপরীতে থাকে, তাহলেও সমস্যা নেই। এ কারণেই উপরোল্লেখিত আয়াতে একটু সামনে গিয়েই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—فاذا عزمت فتوكل على الله অর্থাৎ, পরামর্শ করার পর যখন কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবেন, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করে এর ওপর অটল থাকুন। এখানে আদেশসূচক শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায় অটল থাকার বিষয়টিতে নবিজি একক সিদ্ধান্তের মালিক ছিলেন। তাই তার প্রতিনিধি অর্থাৎ পরবর্তী খলিফাগণও সেরকম ক্ষমতাই লাভ করবেন। যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া ও তার ওপর অটল থাকার বিষয়টি অধিকাংশের মতের ওপর নির্ভরশীল হত, তাহলে একবচন ব্যবহার না করে এখানে বলা হত

اذا عزم اكثركم فتوكلوا على الله— অর্থাৎ, পরামর্শ করার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে সিদ্ধান্ত নেবে, আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাতে অটল থাকবে। কিন্তু এভাবে তো বলা হয়নি।

সুতরাং যে আয়াত দ্বারা তারা গণতন্ত্র প্রমাণ করতে চান, স্বয়ং এর শেষ অংশটিই তাদের দাবি নাকচ করে দেয়। এ ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা হল حفظت شيئا وغابت عنك أشياء অর্থাৎ, কোনো বিষয়ের একটি অংশ ধরতে পেরেছ, কিন্তু তোমার চোখের আড়ালে রয়ে গেছে অনেক কিছু। তারাও গণতন্ত্রের পক্ষে দলিল দিতে গিয়ে ভাসাভাসাভাবে একটি অংশকে ব্যবহার করেন, কিন্তু অন্য অনেক কিছু থেকে চোখ বন্ধ করে রাখেন।

দ্বিতীয় কথা হল—এই আয়াতে শুধু শাসককে বলা হয়েছে তারা যেন জনগণ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন, কিন্তু জনগণকে তো নিজেদের হক মনে করে যেচে গিয়ে পরামর্শ দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়নি। শাসকগণ পরামর্শ গ্রহণ করুক বা না করুক জনগণ গিয়ে তাদের পরামর্শ শুনতে বাধ্য করবে—এমন কোনো নিয়ম নেই। শাসককে পরামর্শ দাও, এটা তোমাদের অধিকার—শরিয়তের কোথাও এ কথা লেখা নেই।

গণতন্ত্রে এ অধিকার দেওয়া আছে—শাসক শুনতে চাক বা না চাক, জনপ্রতিনিধিরা যেচে গিয়ে পরামর্শ দেবে এবং শাসক তা মানতে বাধ্য। ইসলাম তো এ কথা বলে না। তাহলে ইসলামে গণতন্ত্রটা এল কোত্থেকে?[7]

শাসন : একটি দায়িত্ব; অধিকার নয়

তা ছাড়া ইসলাম নির্দেশিত ব্যক্তিশাসন ও অনৈসলামিক গণতান্ত্রিক ব্যক্তিশাসন—এ দুয়ের মাঝে বড় আরেকটি ব্যবধান হল, গণতন্ত্রে শাসনের বিষয়টিকে একটি 'অধিকার' (PRINILEGE) বা একটি 'লাভজনক বিষয়' (ADVANTAGE) হিসেবে দেখা হয়। ফলে, প্রশ্ন তৈরি হয় যে, অধিকারটি কে পাবে এবং কে পাবে না? এবং এজন্যই শাসনক্ষমতা লাভ করার জন্য লোকজন নিজ উদ্যোগে দোড়ঝাঁপ শুরু করে। বিপরীতে ইসলাম একে একটি আমানত ও দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করে, যা শাসকের জীবিকা, সচ্ছলতা ও অন্যান্য সুবিধা উপার্জনের মাধ্যম নয়; বরং, দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য বিশাল ভারী একটি বোঝার মতো। তাই নিজে উদ্যোগী হয়ে ঘাম ঝরিয়ে করায়ত্ব করার জিনিসই নয় এটি; বরং, এ ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হল প্রত্যেকের ভেতরে যেন এই মনোভাব তৈরি হয় যে, সে ভারী এই দায়িত্ব থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতে চেষ্টা করবে। যত দূরে থাকতে পারবে, তার জন্য ততই ভালো। এজন্যই যে নিজে থেকে এ দায়িত্বভার গ্রহণ করতে চাইবে, তাকে অযোগ্য মনে করা হবে। সুতরাং, ইসলামি রাজনীতিতে 'প্রার্থিতা' (CANDIDATURE)-এর ধারণাই নেই।

শাসকের দায়িত্ব

এই কারণে যাকেই শাসনের দায়িত্বটি দেওয়া হবে, তার দৃষ্টিভঙ্গি হবে এমন শাসন মৌলিকভাবে আসল উদ্দেশ্য ও কাঙ্ক্ষিত কোনো বিষয় নয় যে, যেভাবেই হোক একে নিজের জন্য ধরে রাখতে হবে; বরং আসল উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করা। সুতরাং কখনো যদি শাসনক্ষমতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি— এ দুয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, মুহূর্তমাত্র না ভেবে আল্লাহর সন্তুষ্টির সামনে একে কুরবান করে দেব। এ প্রসঙ্গে হাকিমুল উম্মত রহ. এক আলোচনায় বলেন— মনে রেখো, শাসন কখনো মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ যদি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট না হন তাহলে শাসনের দায়িত্বরত অবস্থায় আমরা মূলত ফেরাউনের ভূমিকায় থাকব। এবং এমন শাসনের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক, যার কারণে আমরা ফেরাউনের মতো হয়ে যাই।

শাসনই যদি মূল উদ্দেশ্য হত তাহলে ফেরাউন হামান নমরুদ শাদ্দাদ আল্লাহ তায়ালার অনেক কাছের বান্দা ও নেককার বলে বিবেচিত হত। অথচ তারা বিতাড়িত ও পরিত্যাজ্য হিসেবে ঘোষিত। বোঝা গেল সেই শাসনক্ষমতাই কাঙ্ক্ষিত, যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিও বিদ্যমান। এবং যে শাসনে আল্লাহ সন্তুষ্ট নন তা আমাদের জন্য ভয়ানক এক বিপদ মূলত। আল্লাহর সন্তুষ্টিই আসল। তিনি যদি খুশি

থাকেন, তাহলে মানুষের মল পরিষ্কার করার কাজেও আমরা সন্তুষ্ট ও গর্বিত। মনে করে নেব আমরা মূলত বাদশাহিই করছি।

ইবরাহিম ইবনে আদহামের কথা মনে আছে? তাকে কি আপনারা পাগল মনে করেন? তার তো রাজত্ব ছিল। ছাড়লেন কেন? শুধু এ কারণে যে, তার জীবনের মূল উদ্দেশ্যটি বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। তার এই ঘটনা থেকেও আমরা এই শিক্ষাই পাই—একজন মানুষের জন্য রাজত্বটা মৌলিক কোনো উদ্দেশ্য নয়; বরং মূল উদ্দেশ্য অন্য কিছু। এর মধ্যে যদি বাধা আসতে শুরু করে, তাহলে সে সময় রাজত্ব ছেড়ে দেওয়ার নামই মূলত নতুন করে রাজত্ব লাভ করা। ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ. সব বিষয়ে পণ্ডিত ও ইমাম ছিলেন। হাদিসশাস্ত্রে একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী ও মুহাদ্দিস, ফিকহশাস্ত্রে বিজ্ঞ ফকিহ; আর তাজকিয়া ও আত্মশুদ্ধির জগতে তো একজন রাজাই ছিলেন। তাকে কেউ পাগল বলতে পারবে না। যে বলবে সে নিজে পাগল। তা সত্ত্বেও দেখুন তো তিনি কী করেছেন? যখন দেখলেন আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে রাজত্ব বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, রাজত্বে লাথি মেরে আলাদা হয়ে গেলেন। হজরত আবু বকর ও উমর রা.-এর জন্য রাজত্ব মূল উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর ছিল না, তাই তাদের তা গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু আবু জর রা.-কে রাজত্ব তো অনেক দূর, সাধারণ কোনো দায়িত্ব নিতেও বারণ করা

হয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আবু জর! তুমি কোনো এতিমের মালের দায়িত্ব নেবে না। দুজন মানুষের মোকদ্দমা নিরসনের দায়িত্বও নেবে না। এ থেকেও পরিষ্কার বোঝা যায়—শাসনক্ষমতা মূল উদ্দেশ্য নয়। জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। যদি শাসনক্ষমতা মূল উদ্দেশ্যে ব্যঘাত ঘটায়, সে সময়ই একে নিজের জীবন থেকে আলাদা করে দিতে হবে।[৪]

তাই খলিফা ও শাসকদের দায়িত্ব হল তারা শাসনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করবে। এ উদ্দেশ্যেই ইসলামের বিধানাবলি নিজেরা মেনে চলবে এবং জনগণের মধ্যে কার্যকর ও বাস্তবায়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকবে। অন্যথায় এই শাসন নিষ্ফল। মসনদ আঁকড়ে থাকা তার জন্য বিলকুল বৈধ নয়। হারাম। সে সবসময় নিজের উদ্যোগ ও সিদ্ধান্তবলিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে, আত্মজবাবদিহিতায় মগ্ন হবে এবং এ শরিয়তের প্রশ্নে সামান্যতম গাফলতি থেকেও বেঁচে থাকবে। এটা তার বিশেষ দায়িত্ব।

হাকিমুল উম্মত রহ. বলেন, আমি ভেবে দেখেছি। ইসলামের ইতিহাসে যতগুলো রাজত্ব হারিয়েছে, এর মূল কারণ ছিল শরিয়তের ছোট ছোট জিনিসকে গুরুত্ব না দিয়ে উদাসীন হয়ে থাকা। কারণ, ছোট ছোট গাফলতিগুলো মিলে একসময় গাফলতির পাহাড় তৈরি হয়। এটি একসময় ভিন্ন দিকে মোড় নেয় এবং

সাম্রাজ্য হারানোর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া এখানে আরেকটি বিষয় আছে—কেউ যখন ছোট ছোট বিষয়ে গাফলতি করে, একসময় এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। ফলে, বড় বিষয়গুলোতেও গাফলতি করতে শুরু করে। এ বিষয়টি নিজেই সরাসরি রাজত্ব খোয়ানোর মাধ্যম।[9]

মুসলিম শাসকগণ নিজেরা যেমন জুলুম করা থেকে দূরে থাকবে, তেমনই জনগণকেও এ থেকে বিরত রাখবে। হাকিমুল উম্মত রহ. বলেন, শাসক শুধু নিজে সতর্ক থাকলেই মুক্তি পাবে না; বরং জনগণ যেন জুলুম করার সুযোগ না পায় সে ব্যবস্থাপনা করাও তার দায়িত্ব। সে দেশব্যাপী ঘোষণা ছড়িয়ে দেবে—আমার রাজ্যে ঘুষ আদানপ্রদানের কোনো সুযোগ নেই। কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী যদি ঘুষ চায়, কেউ দেবেন না। আমাদের কাছে অভিযোগ জানাবেন। অভিযোগ জানানোর পর তদন্ত করে যদি দেখা যায় ইতোমধ্যে সে ঘুষের টাকা গ্রহণ করে ফেলেছে, সে টাকা উসুল করে মালিককে ফেরত দেওয়া হবে এবং অপরাধীর জন্য উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। এমনিভাবে, শাসকদের উচিত তাদের ও জনগণের মাঝে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি না রেখে সরাসরি সংযোগ তৈরি করা। কারণ, এই মাধ্যমগুলো অনেক জুলুম ও উৎপীড়ন তৈরি করে। যদি বলেন, জনাব এ তো বড় কঠিন কাজ! আমি বলব শাসক হওয়াও বড় সহজ নয়। এ কি মুখের

কাছে তুলে দেওয়া নলাটি? অনেক কঠিন দায়িত্ব এটা। একজন শাসক মানে সবসময় জাহান্নামের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মানুষ। কখন এর মধ্যে পড়ে যায় সে ভয় তাকে হরদম ঘিরে রাখে।[10]

একটি ইসলামি রাষ্ট্রে শাসক ও আলেমের ভূমিকা কী? তারা কীভাবে নিজেদের মধ্যে কর্ম বণ্টন করে নেবে? এ ব্যাপারে তিনি বলেন,

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে দুটি বিষয় ছিল—নবুয়ত ও খেলাফত। পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদিনের মধ্যেও এ গুণ দুটির সমাবেশ ও সমন্বয় ছিল। অর্থাৎ, তারা তো নবি ছিলেন না, কিন্তু নবি হিসেবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরনের দায়িত্ব আদায় করতেন, তারাও সেগুলো করতেন, এমনিভাবে আল্লাহর খলিফা হিসেবে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন, খুলাফায়ে রাশেদিন সে কাজটিও করতেন।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিষয় দুটো আলাদা হয়ে গেছে। নবি হিসেবে করা কাজগুলোর দায়িত্ব নিয়েছেন উলামায়ে কেরাম আর শাসনের কাজটি করতে শুরু করেছেন আলেম নন এমন লোকজন। এখন শাসকগণ যদি উলামায়ে কেরামকে এড়িয়ে চলেন, তাহলে নবিজির একটি গুণ থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

অপরদিকে উলামায়ে কেরামও যদি শাসকদের পরিত্যাগ করেন, এর দ্বারাও নবিজির অপর একটি

গুণ বাদ দেওয়া হয়। আমাদের প্রয়োজন হল উভয় গুণের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করা। সেটা কীভাবে? আমি শাসকদের বলব তারা উলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ না করে কোনো আইন কার্যকর করতে যাবে না। এবং আলেমদের বলব আইন পাশ হওয়ার পর তারা নিজেরা তা মেনে চলবেন আর সারা দেশে পুরোপুরি বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার জন্য শাসকদের সাহায্য করবেন।

যদি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই গুণদুটোর মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা যায়, তাহলে মুসলমানদের উন্নতি ও সফলতার পথ খুলে যাবে। তাদের ডুবতে বসা তরিটি তীরে লাগবে। আর না হয় বড় বিপদ। আল্লাহই হেফাজতকারী। তাঁর কুদরতি ফয়সালা ছাড়া এ থেকে আমাদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না।[11]

বৈধতার সীমানায় থেকে শাসকদের বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকদের থেকে পরামর্শ নেওয়াও শাসকদের দায়িত্ব। কিন্তু পরামর্শ করার পর কোনো একটি দিকে দিল সায় দিয়ে ওঠে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করে সিদ্ধান্ত করে ফেলেন, তখন সবাইকেই এটি মেনে চলতে হবে। সিদ্ধান্তটি নিজের পছন্দমতো না হলেও দ্বিমতের আর কোনো সুযোগ নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন : শাসকের জন্য উচিত বুদ্ধিমান লোকদের থেকে সবসময় পরামর্শ গ্রহণ করা। পরামর্শ না করলে একটি বিষয়ের অনেক দিকই

চোখের আড়ালে থেকে যায়। এজন্য পরামর্শ করতে হবে; তবে এই নবআবিষ্কৃত গণতন্ত্র একটি ধোঁকা ও প্রতারণামাত্র। বিশেষ করে কাফের ও মুসলিমের সমন্বয়ে যে শাসনক্ষমতা তৈরি হয়, একে অমুসলিম শাসনই বলতে হবে। এমন রাষ্ট্র কখনো ইসলামি রাষ্ট্র হয় না।

একজন জিজ্ঞেস করলেন, পরামর্শ করার সময় যদি পরামর্শ বোর্ডের লোকদের মধ্যে মতভিন্নতা দেখা দেয়, তখন কী করণীয়? শাসকের সাথে মতবিরোধ করা নিন্দনীয় তো নয়!

জবাবে তিনি বললেন, দেখুন, যে মতবিরোধ হেকমতের জন্য হয়, কল্যাণকামিতা ও দীনদারির জন্য হয়, সে মতবিরোধ নিন্দনীয় নয়। কিন্তু সবকিছুরই তো একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। এরপর আর যাওয়া যায় না। সুতরাং, পরামর্শ-মজলিস পর্যন্ত এই মতবিরোধ জায়েজ আছে; কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার পর দ্বিমত করা বা বিরোধিতা করা অবশ্যই নিন্দনীয়। সে সময় তো শুধু আনুগত্য করাই ওয়াজিব। এর অন্যথা করা যাবে না।[12]

তার এ বক্তব্যটি মূলত সে আয়াতটিরই ব্যাখ্যা, যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো; যখন সিদ্ধান্ত করে ফেলবে, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করবে।

শরিয়তের চোখে ইকামতের দীনের জন্য

রাজনৈতিক তৎপরতার গুরুত্ব ও সীমারেখা

তৃতীয় যে বিষয়টিতে হাকিমুল উম্মত রহ.-এর বক্তব্য উপস্থাপন করতে চাচ্ছি, তা হল—একটি বিশুদ্ধ ইসলামি হুকুমত কায়েম করার জন্য চেষ্টা করা এবং অনৈসলামিক সরকার ও তার দোসরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কি মুসলমানদের জন্য আবশ্যক? যদি আবশ্যক হয়, তাহলে এর সীমারেখা কী হবে? এ বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। পুস্তিকাটির নাম—*আর-রাওজাতুন নাজিরা ফিল মাসাইলিল হাজিরা*। এতে তিনি শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি রাজনীতির মূলনীতিগুলো আলোচনা করেছেন, সাথে তাঁর সমকালে প্রচলিত রাজনীতির ব্যাপারেও নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। পুস্তিকাটি সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ, সারগর্ভ ও তথ্যবহুল। কিন্তু রচনাটি যেহেতু আলেম-উলামাদের উদ্দেশ্য করে লেখা, তাই এর ভাষা, ভঙ্গি এবং পরিভাষাগুলোও অ্যাকাডেমিক ধরনে লেখা। সেখানে তিনি বলেছেন :

কুফরি শক্তিকে প্রতিরোধ করা সকল মুসলমানের ওপর ওয়াজিব। বিশেষ করে ইসলামি সরকারের ওপর। এই সরকার খেলাফতপদ্ধতির সরকার হোক বা অন্য কোনো পদ্ধতির, এবং সত্যিকারের ইসলামি সরকার হোক কিংবা নামমাত্র—কুফরি শক্তিকে প্রতিরোধ করা সকলের জন্যই আবশ্যক। বিশেষ

করে পবিত্র স্থানগুলো, যেমন মক্কা-মদিনা ইত্যাদিসহ ইসলামের শিআর বা গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নগুলো রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এটা কখনো ফরজে আইন, কখনো ফরজে কেফায়া। পরিস্থিতি অনুযায়ী হুকুম ভিন্ন হবে। তবে, ফরজ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে। ফিকহের কিতাবগুলোতে সেগুলোর আলোচনা করা হয়।

অন্যতম একটি শর্ত হল সামর্থ্য। সামর্থ্য দ্বারা এখানে শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বিশেষ একরকমের সামর্থ্যের কথা বলা হয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন।

আবু সায়িদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কোনো মন্দ কাজ হতে দেখে, সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে, যদি সম্ভব না হয়, তাহলে মুখ দিয়ে।[13]

বলার অপেক্ষা রাখে না, কথা দিয়ে প্রতিবাদ করার সামর্থ্য সবসময়ই থাকে। সর্বনিম্ন এই সামর্থ্য সাধারণত কখনোই নিঃশেষ হয় না। বোঝা গেল সামর্থ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে—বাধা দিতে গেলে যে পালটা আঘাত আসবে, একে সামাল দেওয়া সাধারণ দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে প্রবল ধারণা না হতে হবে। এতটুকু নিশ্চয়তা থাকলেই সামর্থ্য আছে মনে করা হবে।

এমনিভাবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে—প্রতিরোধ করতে গিয়ে এর চেয়ে বড় ক্ষতির মুখোমুখি যেন না হতে হয়। যেমন, কাফেরের জায়গায় সেই আরেক কাফের শাসকই এল। অথবা, কাফের-মুসলিমের সম্মিলিত কোনো সরকার এল; কারণ, নিয়ম হল—সমষ্টি সর্বনিম্নটার অনুগামী হয়। তা দিয়েই সমষ্টিকে বিচার করা হয়। কেননা এ সকল অবস্থায় মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য—পৃথিবীকে ফাসাদমুক্ত করা—এই লক্ষ্যটাই নাই হয়ে যায়। আর কোনো বিষয় যখন লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ে, তার কোনো মূল্য থাকে না।

এখন কোথাও যদি এমনটি ঘটার আশঙ্কা থাকে, তাহলে প্রতিরোধ করা আর ওয়াজিব হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে না। জায়েজ থাকবে? এখানেও বিশ্লেষণ আছে। কোনো কোনো পরিস্থিতিতে জায়েজও হবে না। আবার কখনো জায়েজ হবে, কখনো মুস্তাহাব। কোনটা কখন? এটা ইজতেহাদ ও গবেষণানির্ভর বিষয়। ফলে, শরিয়তবিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মাঝে এখানে দুটি জায়গায় মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে :

এক. অ্যাকাডেমিক দিক থেকে মতপার্থক্য : পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে কারও মনে হতে পারে এই সময়ে প্রতিরোধে যাওয়া জায়েজ হবে না, কারও নিকট মনে হবে জায়েজ, কারও কারও মতে শুধু জায়েজ নয়, মুস্তাহাবও বটে।

দুই. বাস্তবায়ন ও উদ্যোগী হওয়ার ক্ষেত্রে : দুজন বিশেষজ্ঞ প্রতিরোধ করা জায়েজ বা মুস্তাহাব হওয়ার

বিষয়ে একমত হওয়ার পরও কেউ রুখসত বা ছাড়ের ওপর আমল করতে চাইবেন, কেউ মুস্তাহাব হিসেবে আজিমত বা দৃঢ়তার ওপর আমল করতে চাইবেন। এমতাবস্থায় কেউ কাউকে দোষারোপ ও নিন্দা করার সুযোগ নেই।

কোথাও যদি এমন হয়—শাসনক্ষমতা মুসলমানদের হাতেই আছে বটে; কিন্তু শাসক কাফেরদের সাথে সখ্যতা রেখে রেখে চলে, তাহলে একে সরাসরি কাফের শাসন বলা যাবে কি না ভেবে দেখার বিষয়।[14]

মোটকথা

ইসলামি হুকুমত কায়েমের জন্য চেষ্টা করা, সংঘবদ্ধতা ও রোডম্যাপ তৈরি করা, গণমানুষের মধ্যে জাগরণ তৈরির জন্য বিভিন্ন কার্যকরী প্ল্যান-পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগী হওয়া—এ সবকিছু ওয়াজিব। পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনো সুনির্দিষ্টভাবে সকলের ওপর ওয়াজিব হয়, কখনো কিছু মানুষ দায়িত্বটি পালন করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়। কিন্তু এর জন্য দুটো শর্ত রয়েছে : এক. পর্যাপ্ত শক্তি ও সামর্থ্য থাকতে হবে। দুই. ইসলামি হুকুমত কায়েম করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত কর্মযজ্ঞের কারণে চলমান বিপর্যয় থেকে আরও বড় কোনো বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না থাকতে হবে।

কিন্তু যদি সামর্থ্য না থাকে, কিংবা এর চেয়ে বড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকে, তাহলে তা ওয়াজিব নয়। অবশ্য পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনো মুস্তাহাব হবে, কখনো স্রেফ জায়েজ বা বৈধ। এবং কখন কোনটি হচ্ছে, এ নিয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য হতে পারে। এই মতানৈক্য যদি ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে হয়, তাহলে তা যেমন নিন্দনীয় নয়, তেমনই কেউ কাউকে দোষারোপ করারও সুযোগ নেই।

কিন্তু যে কথাটি কখনোই ভুলে থাকা চলবে না, তা হল—দীনের আসল উদ্দেশ্য যেহেতু রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও হুকুমত কায়েম করা নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য হল, দীনদারি এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন, তাই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সকল কিছুই দীন ও শরিয়তের বৈধ সীমানার ভেতরে থেকেই করতে হবে। এ বিষয়টি আমরা পেছনে হাকিমুল উম্মত রহ.-এর জবানিতেই বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি। হুকুমত কায়েম করার জন্য দীনের সামান্য থেকে সামান্য কোনো বিধানও লঙ্ঘন করা যাবে না, এড়িয়ে চলা যাবে না ইসলামের সামান্য কোনো চাওয়াকেও। এটা করা তখনই সম্ভব, যখন এ কাজে অংশগ্রহণ করা লোকগুলো সবার আগে নিজেদের জীবনে পুরোপুরি শরিয়ত অনুসরণ করে চলবে এবং রাজনৈতিক সকল কাজ সম্পাদন করবে কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য, পরিপূর্ণ ইখলাস ও বিশুদ্ধ নিয়তের সাথে। গণমানুষের

করতালি, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি কোনো কিছুই তাকে প্ররোচিত করবে না, অবুঝ মানুষদের নিন্দাবাক্যও তাকে করবে না বিচলিত। জাগতিক কোনো স্বার্থ যত মোহনীয়ভাবেই সামনে এসে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করুক, নিজেকে কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এমন আত্মশক্তি ও বিশুদ্ধ হৃদয় আছে যার, এ পথে কেবল সেই যেতে পারে। অন্যথায়, রাজনীতি আসলে এমন এক পিচ্ছিল পথ, যেখানে পায়ে পায়ে লোভ ও লালসার হাতছানি, নাম ও যশখ্যাতির প্রলোভন, ক্ষমতার মোহ ইত্যাদি নানা ফেতনা এসে তাকে পথচ্যুত করে ফেলবে। এই শুদ্ধতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণশক্তি যার নেই, এসবের হাতছানি এড়িয়ে থাকা তার পক্ষে খুব মুশকিল। হয়তো সে জানে, কিন্তু নিজের প্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনায় নিজের মতো নানা ব্যাখ্যা বানিয়ে নেবে। এভাবে আত্মপ্রবোধ লাভ করে সে কখন যে স্রোতে হারিয়ে যাবে, টেরটিও পাবে না। একসময় দেখা যাবে, তার রাজনীতি আর ইসলামি রাজনীতি নেই, ধর্মহীন স্বার্থের রাজনীতিতে পরিণত হয়ে গেছে।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও চারিত্রিক শুদ্ধতা

তাই এ সকল রাজনৈতিক চেষ্টা ও পরিশ্রমের প্রথম শর্ত হল মানুষের আমল ও চরিত্রের পরিশুদ্ধি এবং চিন্তা ও চেতনায় মধ্যপন্থা ধারণ করা। ঠিক এ

কারণেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ২৩ বছরের নবুয়তকালের প্রথম ১৩ বছর শুধু প্রাথমিক এই প্রস্তুতিতেই গিয়েছে। এ সময়ে না কোনো যুদ্ধ-জিহাদ ছিল, না ছিল রাজনীতি ও রাষ্ট্রশাসন সংক্রান্ত কোনো পদক্ষেপ। প্রতিপক্ষ যদি আঘাতও করত, পীড়ন ও যন্ত্রণায় জর্জরিত করত, তবু পালটা হাত ওঠানোর অনুমতি ছিল না। কেবলই সবর ও সয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে বারবার। এই ১৩ বছর ছিল শিক্ষা, পরিচর্যা, আত্মশুদ্ধি ও দীক্ষার কাল। আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের সুদীর্ঘ এই পথ পাড়ি দিয়ে তারা যখন বলীয়ান হয়ে উঠলেন, তখন মাদানি জীবনে গিয়ে যুদ্ধ ও জিহাদ, রাষ্ট্রগঠন ও প্রশাসন পরিচালনার ধারাবাহিক কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে।

হাকিমুল উম্মত রহ. এই বিষয়টি পরিষ্কার করতে গিয়ে বলেন : দেখুন, এ বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য আমি খুব সূক্ষ্ম একটি কথা বলি। মক্কায় থাকতে মুসলমানদের জিহাদের অনুমতি দেওয়া হল না, অনুমতি দেওয়া হয়েছে মদিনায় যাওয়ার পর। কেন? যারা গভীর থেকে ভাবতে জানে না তারা বলবে, তখন মুসলমান সংখ্যায় কম ছিল, যুদ্ধের হাতিয়ারও ছিল না তেমন। কিন্তু, এ কথা বাস্তবতাবিরোধী। কারণ, মদিনায় গিয়েই কি তাদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল? কাফেররা তখনো তো প্রবলই ছিল। সমগ্র আরবের বিপরীতে মদিনার সকল মুসলিম মিলিয়ে কজনই বা হবে? বরং, শুধু আরব কেন, ইসলামের এ

যুদ্ধ তো ছিল পৃথিবীর সকল কাফেরের বিরুদ্ধে। তখন মদিনা কেন, পুরো আরবকেও যদি মুসলমান ধরা হত, তবু তো সংখ্যায় তা নিতান্ত অল্প। এমনিভাবে মদিনায় গিয়েই কি অস্ত্রশস্ত্র বেড়ে গিয়েছিল? স্বয়ং কুরআন-হাদিসের বক্তব্য থেকেই আমরা দেখি, বেশির ভাগ যুদ্ধেই মুসলিমদের সংখ্যা এত কম ছিল যে, ফেরেশতাদের এসে সাহায্য করতে হয়েছে। এই যে, ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করা, এটা তো মক্কায় থাকতেও সম্ভব ছিল, তবু কেন সেখানে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হল না? এ জায়গাটি ভাবনার বিষয়। আমাদের এমন কোনো কারণ বের করতে হবে, যা দিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর বের করা সম্ভব। যারা শুধু বাহ্যিক অবস্থা দিয়ে সবকিছু বিচার করেন, তাদের কাছে এর কোনো সদুত্তর নেই।

কিন্তু গভীর জ্ঞানের অধিকারী যারা, তারা বলেছেন, আসল কথা হল—মক্কায় অবস্থানের সময়টিতে সাধারণ মুসলমান তখন পর্যন্ত উত্তম আখলাক, ইখলাস, সবর ও তাকওয়ার সেই কাঙ্ক্ষিত গভীরতাটি লাভ করে উঠতে পারেননি। ফলে, সে সময় যদি জিহাদের অনুমতি দেওয়া হত, তবে পুরো যুদ্ধটিই হত ক্রোধ চরিতার্থ করা ও ব্যক্তিগত প্রতিশোধপরায়ণতা থেকে। সেখানে ইখলাস থাকত না, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার চেতনাও থাকত না। ফলে, তখন তারা আল্লাহর গায়েবি সাহায্য ও

যুদ্ধের ময়দানে ফেরেশতাদের সরাসরি সঙ্গ পাওয়ার যোগ্য হতে পারতেন না।

কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে—'হ্যাঁ, অবশ্যই, যদি তোমরা সবর করো এবং তাকওয়ার অধিকারী হও।' এই আয়াতে এ কথাটিই বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহর সাহায্য তখনই পাওয়া যাবে, যখন মুসলমান গভীরভাবে নিজেদের জীবনে সবর ও তাকওয়া ধারণ করবে। (তাকওয়া মানে কী? মানে হল : আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকা এবং যা করতে আদেশ করেছেন, তা পালন করা। এসবের মধ্যে ইখলাসও অন্তর্ভুক্ত এবং প্রসিদ্ধি, খ্যাতির মোহ, লোক দেখানো ও প্রবৃত্তির আহ্বান থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশও অন্তর্ভুক্ত।) মদিনায় যাওয়ার পর তারা নিজেদের চরিত্রে এ ব্যাপারগুলো পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। মক্কায় থাকাকালে মুহাজিররা কাফেরকর্তৃক যে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, এর দ্বারা কাফেরদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করা তাদের জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল এবং ব্যক্তিগত ক্রোধের বিষয়টিকেও অতিক্রম করে এসেছিলেন খুব ভালোভাবেই। তাদের জীবনে আমরা দেখতে পাই মানবিক এই দুর্বলতাটি শুধু শক্তিহীন নয়, বলতে গেলে পুরোপুরিই দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল।

এমনিভাবে হিজরত করতে গিয়ে তারা যখন ধনদৌলত, ঘরসংসার, পরিবারপরিজন সবকিছু কোনো ধরনের দ্বিধা ছাড়াই পরিত্যাগ করতে

পারলেন, তখন তাদের আল্লাহ-প্রেম পূর্ণ হয়ে আপনরূপে বিকশিত হল। পার্থিব জীবনটি তাদের হৃদয় থেকে বেরিয়ে গেল চিরদিনের জন্য, সম্পূর্ণভাবে। এমনিভাবে মদিনার আনসাররা মুহাজিরদের সাথে যে তুলনাহীন উদার ও সহমর্মিতার আচরণ করলেন, এর দ্বারা আল্লাহর ভালোবাসায় তাদের হৃদয় ভরে উঠতে পেরেছেন এবং পূতপবিত্র হয়ে উঠতে পেরেছেন পার্থিব সমস্ত লোভলালসা থেকে। আমরা দেখি, আনসাররা হাসতে হাসতে নিজেদের জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ সব মুহাজিরদের মাঝে বিলিয়ে দিচ্ছেন। বংশীয় ওয়ারিসের মতো আপন করে নিচ্ছেন তাদের।

মোটকথা, হিজরতের ঘটনার মধ্য দিয়ে মুহাজির ও আনসার—দুদলেরই পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল এবং এতে তারা শত ভাগ পাশ করে এসেছিলেন। এরপরই তাদের জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কারণ, নিজেকে পরিশুদ্ধ করার এই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার পর এখন তারা যা করবে, কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই করবে। ব্যক্তিগত ক্রোধ ও প্রতিশোধপরায়ণতা থেকে নয়। এবং তারা আল্লাহর গায়েবি সাহায্য ও নানা সংকটপূর্ণ সময়ে সরাসরি রহমতের ফেরেশতাদের সঙ্গ লাভের যোগ্য হয়ে উঠবে। সাহাবায়ে কেরামের জীবন দেখলে আমরা এটিই দেখতে পাই—তারা ছোটবড় যা-কিছু করতেন, আল্লাহকে পাওয়ার জন্যই। *মসনবি শরিফে* আলি রা.-

এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে : যুদ্ধের ময়দানে তিনি একবার এক কাফেরকে জমিনে ফেলে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। এমন সময় লোকটা কী করবে দিশা না পেয়ে তার মুখে থুথু মেরে বসল। আমাদের সাধারণ বুদ্ধি কী বলে? তিনি লোকটাকে আরও দ্রুত হত্যা করবেন। কিন্তু থুতু দেওয়ার পর হজরত আলি সাথে সাথে লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এতে ইহুদি লোকটা খুবই অবাক হল। জিজ্ঞেস করল—এমনটি কেন করলেন? তিনি বললেন, প্রথম যখন তোমাকে হত্যা করতে চাইলাম, তখন আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া আমার আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু যখন তুমি থুতু দিলে, তখন আমার মনের ভেতরে ভীষণ রাগ ও প্রতিশোধের নেশা তৈরি হল। ভেবে দেখলাম এখন যদি তোমাকে হত্যা করি, তাহলে শুধু আল্লাহ তায়ালাকে খুশি করার জন্য হবে না; এখানে ব্যক্তিগত রাগ মেটানোর বিষয়টিও কাজ করবে। আমি চাইনি আমার কোনো কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর জন্য হোক। তাই তোমাকে ছেড়ে দিলাম। এ কথা শুনে ইহুদি লোকটা সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেল। কারণ, সে বুঝে গেছে সত্য দীন এটিই। এখানে অনুসারীদের হৃদয়ে শিরকের প্রতি এত প্রবল ঘৃণা তৈরি করা হয় এবং এত সূক্ষ্মভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় বিষয়টি যে, এরপর তারা আর কোনো কাজই নফসের তাড়নায় করে না।

এমনকি বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মধ্যেও নফসের পছন্দ ও অপছন্দকে এড়িয়ে চলে।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের অবস্থা কী? যে লোকগুলো দাবি করে আমরা ইসলামের সেবার জন্যই কাজ করছি—অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়, এদের বেশির ভাগই প্রবৃত্তিপূজায় আক্রান্ত। নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজও ফলাও করে প্রচার করে, পত্রিকায়, টেলিভিশনে, বক্তৃতায়। আল্লাহর বিধিবিধানের পরোয়া করে না। তাদের কথা একটাই—কাজ হোক। তা কি আল্লাহর জন্য হচ্ছে নাকি শরিয়তের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, দেখার সময় নেই। চাঁদা কালেকশন করতে গিয়ে জায়েজ নাজায়েজের তোয়াক্কা নেই, আয়-ব্যয়ে নেই হালাল-হারামের বাছবিচার। আমাকে বলুন, এরপরও আল্লাহর সাহায্য কীভাবে আসবে? বড় অদ্ভুত এক মানসিকতা গড়ে উঠেছে যে, আজকাল মানুষ প্রকাশ্যেই বলে—ভাই, এখন কাজ হওয়া দরকার, তা হতে দেন, এত মাসলা-টাসলা নিয়ে আসবেন না। এসব মাসলা-মাসায়েল পরে দেখা যাবে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এই লোকগুলোর খবর নেই যে, মাসআলা-মাসায়েল ছাড়া তো মুসলমানদের না জাগতিক উন্নতি হওয়া সম্ভব, না পরকালীন। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হল ইখলাস ও নিয়তের শুদ্ধতা। এখানে তা একেবারেই শূন্যের কোঠায়।[15]

এ কথা প্রসিদ্ধ, হাকিমুল উম্মত রহ. হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে আলাদা হয়ে থেকেছেন।

সে সময়ে এক লোক এসে প্রস্তাব করল—আমরা আপনাকে আমিরুল মুনিনিন হিসেবে মেনে নিলাম। এবার আপনি আমাদের নেতৃত্ব দিন। তিনি প্রথমে স্বাভাবিক যে জবাব দেওয়ার ছিল, তা দিলেন, এরপর বললেন, আমিরুল মুমিনিন হয়ে সর্বপ্রথম যে নির্দেশটি দেব, তা হল—আগামি ১০ বছর সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ। এ সময়ে শুধু মুসলমানদের আত্মিক উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালানো হবে। এরপর যখন সন্তোষজনক পরিবেশ তৈরি হবে, তখন পরবর্তী নির্দেশ দেব।[16]

আমরা যদি বাস্তবতার নিরিখে নিজেদের যাচাই করি, টের পাব হাকিমুল উম্মত রহ. এ কথার মাধ্যমে আমাদের একদম মূল শিরাটিতে হাত দিয়েছেন। বর্তমানে রাজনীতির ময়দানে আমরা যে ব্যর্থ হচ্ছি, এর মূল কারণ এটিই। আমরা মক্কি-জীবনের ১৩ বছর বাদ দিয়ে প্রথম দিন থেকেই মাদানি-জীবনের অনুশীলন শুরু করে দিতে চাই। নিজেদের ঠিক করার আগেই জাতিকে সংশোধনের কাজে কোমর বেঁধে নেমে পড়ি। অথচ, আমরা এটুকুও জানি না এই শুদ্ধি অভিযানের পতাকাটি কীভাবে বহন করতে হবে এবং কীভাবে একে মাথার ওপর উঁচিয়ে ধরতে হবে। এ কাজের জন্য আমাদের কোনো ধরনের তরবিয়ত ও অনুশীলন পর্যন্ত নেই। আমরা দেখলাম অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ঝান্ডা উঁচিয়েছে, অমনি তাদের দেখাদেখি

নিজেরাও উঁচিয়ে ধরেছি। ফলে, পরিণতি দাঁড়িয়েছে এই—আমাদের রাজনৈতিক সকল কর্মকাণ্ড, চেষ্টা ও কর্মপন্থা, পছন্দ ও অপছন্দ বলতে গেলে সবকিছু অন্যদের থেকে ধার করে নেওয়া এবং এগুলো শরিয়তের মানদণ্ডে না মেপেই এই বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছি, ধর্মহীন রাজনীতি যদি এই পন্থায় সফল হতে পারে, ইসলামি রাজনীতিও আপন গন্তব্যে উপনীত হতে পারবে। অথচ বাস্তবতা হল ইসলামি রাজনীতিকে ধর্মহীন রাজনীতির সাথে তুলনা করা খেজুরগাছকে কুয়ার সাথে তুলনা করার মতো!

রাজনৈতিক কৌশল ও কিছু কথা

হজরত হাকিমুল উম্মত রহ. নিজের গ্রন্থ ও বিভিন্ন আলোচনায় বারবার এ কথার ওপর জোর দিয়েছেন—ইসলামি রাজনীতিতে শুধুমাত্র উদ্দেশ্যটি নেক ও শরিয়তসম্মত হলেই হবে না; বরং কর্মপদ্ধতি এবং কৌশলগুলোও শরিয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী হতে হবে। কেউ যদি শরিয়তের বিধিবিধানের তোয়াক্কা না করে, কুরআন ও হাদিসের বিরুদ্ধাচরণ করে ইসলামি হুকুমত কায়েম করে ফেলবে মনে করে, তাহলে তা নিছক খামখেয়ালিপূর্ণ কাজ। নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়। এর পরিণতি শুধুই বঞ্চনা। ঘটনাক্রমে যদি ক্ষমতা পেয়েও যায়, তাহলে সেটি ইসলামি হুকুমত হবে না, ইসলামি হুকুমতের নামে বিভ্রান্তি শুধু।

ইসলামে রাজনীতি ও রাষ্ট্রশাসন মৌলিক কোনো উদ্দেশ্য নয়; বরং মূল বিষয় হল শরিয়তের অনুসরণ এবং এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ। এ বিষয়ে পুস্তিকার শুরুতে থানবি রহ.-এর বিস্তারিত বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে তিনি অত্যন্ত মজবুত দলিল দিয়ে একে প্রমাণ করেছেন। সুতরাং ইসলামি হুকুমত কায়েম করার চেষ্টা করতে গিয়ে শরিয়তের কিছু বিধান উপেক্ষা করাতে কোনো সমস্যা নেই এবং রাষ্ট্রশাসনকে সর্বোচ্চ লক্ষ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তা অর্জনের জন্য শরিয়তের শাখাগত বিভিন্ন

বিধানকে কুরবানি করা জায়েজ আছে—এমন চিন্তা কোনোভাবেই ইসলামের সাথে যায় না; বরং সকল মুসলমানের জন্য উচিত হল শরিয়তের গণ্ডির ভেতরে থেকেই চেষ্টা ও সাধনা চালিয়ে যাওয়া এবং সেসব কৌশলই গ্রহণ করা, যেসবের কারণে শরিয়ত লঙ্ঘন করতে না হয়। মুসলমানদের সফলতার গোপন রহস্য শরিয়তকে অনুসরণ করার মধ্যেই নিহিত। এ পথে চললেই আল্লাহ তায়ালা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুতরাং সফলতাও ইনশাআল্লাহ এ পথেই আসবে।

আর যদি ধরেও নেওয়া হয়—শরিয়তের কোনো বিধান পালন করতে গেলে বাহ্যিক কোনো সফলতা হাতছাড়া হয়ে যাবে, তাহলে হোক। মুসলমান এর চেয়ে বেশি কিছু করার জন্য আদিষ্ট নয়। জাগতিক এই ব্যর্থতার দায়ভার তার ওপর বর্তাবে না। আখেরাতেও এর জন্য তাকে কোনো জবাবদিহিতার মুখে পড়তে হবে না। এদিক-সেদিক না তাকিয়ে সে যদি পূর্ণরূপে শরিয়ত অনুসরণ করে চলতে পারে, এটুকুই তার জন্য পরিপূর্ণ সফলতা। সে প্রতিদানের জন্য যোগ্য হয়ে উঠবে এবং তার জীবনের যে মূল লক্ষ্য তা সর্ব অর্থে অর্জিত হবে।

এজন্য রাজনীতির ময়দানে কাজ করতে গেলে প্রতিটি কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণের আগে সুনিশ্চিত হয়ে নিতে হবে—শরিয়তের দৃষ্টিতে তা জায়েজ নাকি নাজায়েজ? কোনো কৌশল গ্রহণের জন্য শুধু এটুকু

যথেষ্ট নয় যে, এটি রাজনীতিতে বিশ্বজুড়ে প্রচলিত ও সমাদৃত। বা এটি রাজনীতিতে অব্যর্থ এক অস্ত্র। বর্তমানে এ ছাড়া রাজনীতি কল্পনাও করা যায় না। শরিয়তের মূলনীতির আলোকে বিষয়টি যদি নাজায়েজ হয় বা শরয়ি বিশ্লেষণের আলোকে এর মধ্যে অনিষ্টতা ও আপত্তি থাকে, তাহলে বর্তমান রাজনীতি বিশেষজ্ঞগণ একে যতই আবশ্যক ও অবিকল্প হিসেবে দেখুন না কেন, কোনোভাবেই তা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ, রাজনীতি আমাদের মূল উদ্দেশ্য নয়; মূল উদ্দেশ্য হল শরিয়তের আনুগত্য ও অনুসরণ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন এবং সাহাবায়ে কেরামের ঘটনাবলিতে এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে তাঁরা ভীষণ কার্যকরী অনেক কৌশলও পরিত্যাগ করেছেন শুধু এ কারণে যে, এটি শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিক।

বদরের যুদ্ধটি ছিল ইসলামি ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ, যেখানে সত্য ও মিথ্যা যুদ্ধের ময়দানে প্রথমবারের মতো মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। মুসলমানদের পক্ষে ছিলেন সাকুল্যে তিনশ তেরোজন সৈনিক, অস্ত্র বলতে যাদের তেমন কিছুই ছিল না। এমন ভীষণ পরিস্থিতিতে একজন সৈনিকের মূল্যও অনেক। ঘটনাক্রমে সামান্য একটু শক্তিও যদি বাহিনীতে বৃদ্ধি পেত, তাহলে বিজয় লাভের ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারত। এমন সংকটময় মুহূর্তে হুজায়ফা ইবনে ইয়ামান রা.-এর মতো লড়াকু যোদ্ধা

ও তার পিতা এসে মুসলিমবাহিনীতে যোগদানের আবেদন করলেন। কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এ কারণে তাদের যোগ দিতে বারণ করলেন, মদিনায় আসার পথে কাফেররা তাদের আটক করে ফেলেছিল এবং এ শর্তে মুক্তি দিয়েছিল যে, তারা যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করবে না। নবিজি তাদের আবেদন ফিরিয়ে দিয়ে বললেন : نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم আমরা তাদের সাথে কৃত ওয়াদা রক্ষা করব এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য চাইব।[17]

এই যুদ্ধেই একজন মুশরিক নবিজির সাথে যুদ্ধে শরিক হতে চাইল। সে ছিল খুবই অভিজ্ঞ এক যোদ্ধা। লড়াইয়ের কৌশল ও বাহাদুরিতে সবার মাঝে তার প্রসিদ্ধি ছিল। কিন্তু এটা ছিল সত্য-মিথ্যার প্রথম লড়াই। এ লড়াইয়ে কোনো কাফের থেকে সাহায্য নেওয়া ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। সে সময় নির্দেশনা এমনই ছিল—কোনো কাফের থেকে সাহায্য নেওয়া যাবে না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, ফিরে যাও; আমরা কোনো মুশরিক থেকে সাহায্য নেব না।[18]

খোলাফায়ে রাশেদিনের অবস্থান তো অনেক ওপরে, পরবর্তী সাহাবায়ে কেরামও সর্বদা এই মূলনীতিটি অনুসরণ করে চলেছেন। হজরত মুআবিয়া

রা.-এর শাসনামলে রোমকদের সাথে একবার শান্তিচুক্তি চলছিল। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেভাগেই হজরত মুআবিয়া সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে ফেললেন। এরপর সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে হামলা শুরু করলেন। রোমকরা আচানক এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাই পিছু হটতে লাগল। মুআবিয়া রা. এলাকার পর এলাকা জয় করে সামনে এগোতে লাগলেন। ইত্যবসরে সাহাবি আমর ইবনে আবাসা রা. পেছন থেকে দ্রুত বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে মুআবিয়া রা.-এর পথরোধ করে দাঁড়ালেন। এরপর একটি হাদিস শোনালেন, যার আলোকে এই হামলা বৈধ হয় না। মুআবিয়া রা.-এর ধারণা ছিল, আক্রমণটি যেহেতু শান্তিচুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরই করা হয়েছে, তাই এটা চুক্তিভঙ্গের আওতায় পড়ে না। কিন্তু আবাসা রা.-এর থেকে হাদিসটি শোনামাত্রই কোনো ব্যাখ্যা ও তাবিলের আশ্রয় না নিয়ে বিজিত এলাকা ছেড়ে পুরো বাহিনী নিয়ে সোজা ফিরে এলেন।[19]

যে সেনাপতি নিজের সফল একটি কৌশল নিয়ে বিজয়ের নেশায় সামনে এগিয়ে যায়, তার জন্য আক্রমণ থামানোই তো মহা মুশকিল, সে জায়গায় বিজিত এলাকা ছেড়ে দিয়ে পিছু হটা তো অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু মূল লক্ষ্য যেহেতু সিয়াসাত ও রাষ্ট্রশাসন নয়, বরং শরিয়তের আনুগত্য ও অনুসরণ,

তাই এ অভিযান অবৈধ হওয়ার বিষয়টি জানামাত্রই তিনি ফিরে এসেছিলেন।

তো, আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এমন অভাবনীয় অতুলনীয় সব উদাহরণে ভরপুর, যাতে মুসলমানরা যত কার্যকর কৌশলই হোক না কেন, এর কারণে শরিয়তের ক্ষুদ্র একটি বিধান লঙ্ঘন করতেও সম্মত হয়নি; বরং সে কৌশলটিই ছুড়ে ফেলেছে।

এজন্য ইসলামি রাজনীতিতে সকল কর্মকাণ্ড শরিয়তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়া জরুরি। কিন্তু দুঃখজনক হল বর্তমানে এ বিষয়টি কীভাবে যেন সকলের চোখের আড়ালে চলে গেছে। ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন প্রচলিত রাজনীতির চিন্তক ও বিশেষজ্ঞরা যে পদ্ধতি ও কৌশল ঠিক করে দেন এবং যেগুলো বিশ্বজুড়ে সমাদৃত রেওয়াজে পরিণত হয়েছে, সেগুলোই ইসলামি রাজনীতিতে গ্রহণ করা হচ্ছে, অথচ এটা দেখার প্রয়োজন মনে করা হচ্ছে না—এ ব্যাপারে শরিয়ত কী বলে? কৌশলটি এবং এর সাথে আবশ্যকীয়ভাবে যুক্ত অন্য সকল বিষয় শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ নাকি নাজায়েজ? থানবি রহ. এমন বেশ কিছু বিষয়কে কুরআন ও হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং এসবের শরয়ি বিধানগুলো সুস্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করেছেন।

বয়কট ও হরতাল

উদাহরণত সরকার থেকে নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য আজকাল হরতাল পালন করা হয়। ব্যাপার যদি শুধু এতটুকু হত যে, লোকজন দাবি আদায়ের জন্য স্বেচ্ছায় নিজেদের ব্যবসাবাণিজ্য ও গাড়িঘোড়া বন্ধ করে রাখে, তাহলে অন্যান্য ক্ষতিকর দিক না থাকার শর্তে একে একটি বৈধ কৌশল বলা যেত। এ প্রসঙ্গে হাকিমুল উম্মত রহ. বলেন, বয়কট বা নন কো-অপারেশন—শরিয়তের চোখে একে জিহাদের অংশ বলার সুযোগ নেই। (প্রমাণবিষয়ক আলোচনায় বিষয়টি দেখে নেবেন।) এ বরং স্বতন্ত্র একটি প্রতিবাদ পদ্ধতি, যা মৌলিকভাবে বৈধ।[20]

কিন্তু এমন হরতাল বা বয়কট, যা সকলে খুশি মনে পালন করে, দুনিয়ায় এর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। বেশির ভাগ সময়ই মানুষকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এসবে অংশ নিতে বাধ্য করা হয়। কেউ অস্বীকৃতি জানালে তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়, আর্থিকভাবেও ক্ষতির মুখে ফেলা হয়। পাশাপাশি মারামারি ও বোমাবাজি তো হরতালের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পথঘাটে মানুষ ও গাড়ি চলাচল আটকে দেওয়া হয়, গাড়ি ভাঙচুর হয় অনেক, ব্যবসায়ীরা হামলার ভয়ে দোকানপাট বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়, আর বিশেষ প্রয়োজনে যাদের বাইরে বের হতেই হয়, তারাও সবসময় ভয়ে থাকে কখন কী হয়ে যায়। হরতাল চলাকালীন অনেক নিরীহ মানুষ মারা যায়,

অনেক রোগী হসপিটালে যেতে না পেরে কাতরাতে কাতরাতে মারা যায় এবং অনেক দিনমজুর-দরিদ্র মানুষের জীবন অর্থ ও খাদ্য সংকটে পড়ে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

এসব বর্তমানে হরতালের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এসব ছাড়া একটি সফল হরতালের কল্পনাও করা যায় না। বোঝাই যাচ্ছে, এগুলো শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম। আর যে জিনিসটির কারণে এত সব হারাম কাজ করতে হয়, তা জায়েজ হয় কীভাবে? এজন্য হাকিমুল উম্মত রহ. প্রচলিত হরতালকে নাজায়েজ বলতেন। খেলাফত আন্দোলনের সময় যে 'অনশন আন্দোলন' চলছিল, এর মধ্যে হরতালও ছিল। এ আন্দোলনের একটি সিদ্ধান্ত ছিল ব্রিটিশ পণ্য বয়কট করা। ফলে, ব্রিটিশ পণ্য বিক্রি করে এমন দোকানগুলোতে আন্দোলনের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত করে দেওয়া হত, যাদের কাজ ছিল যেভাবেই হোক ক্রেতাদের সেসব দোকান থেকে ফিরিয়ে রাখতে হবে। একান্ত কিনেই যদি ফেলত কেউ, তখন পণ্য ফেরত দিয়ে আসতে বাধ্য করা হত। এমনকি দোকানদারদেরও বাধ্য করা হত তারা যেন ব্রিটিশ পণ্য না রাখে। যদি কেউ অমান্য করত, তাকে নানাভাবে শায়েস্তা করা হত, লোকটার জীবিকা নির্বাহের অন্য কোনো মাধ্যম আছে কি নেই তা দেখার প্রয়োজন বোধ করা হত না। তার পরিবার কি না খেয়ে মরল, সে নিয়েও কারও ভাবনা ছিল না।

হাকিমুল উম্মত রহ. এমন পদ্ধতির বয়কট নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এই ঘটনার মধ্যেও অনেকগুলো গুনাহের কাজ জড়িয়ে আছে। এক হল— একটি বৈধ কাজ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা। কারণ, বিশেষ কিছু জিনিস ছাড়া বাকি সকল পণ্য বেচাকেনা আহলে হারব তথা যুদ্ধে লিপ্ত শত্রুদের সাথেও করা জায়েজ, চুক্তির আওতাধীন লোকদের সাথে তো বটেই।

দ্বিতীয়ত, ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর পণ্য ফেরত দিতে বাধ্য করা আরও বড় গুনাহ। কারণ, 'খেয়ারের শর্ত' বা পণ্য ফেরত দেওয়ার স্বাধীনতা থাকার শর্ত না থাকলে ফেরত দেওয়াটা মূলত নতুন করে কেনাবেচার মতোই। ফলে, এখানে উভয় পক্ষের সম্মতি আবশ্যক। এ ছাড়া তা জায়েজ হবে না। কিন্তু তৃতীয় পক্ষ এসে বাধ্য করলে সে সম্মতি পাওয়া গেল কীভাবে?

তৃতীয়ত, কেউ এই জবরদস্তি মানতে অস্বীকার করলে তাকে নানাভাবে কষ্টে ফেলা জুলুম। এটা আরেকটা অপরাধ। চতুর্থত, ক্রেতা বা ব্যবসায়ীর পরিবার-পরিজনকে অসুবিধায় ফেলাও গুনাহের কাজ। এটাও জুলুম। পঞ্চমত, একে শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব বলে ঘোষণা করা হলে তা শরিয়ত বিকৃতি হবে।

বয়কটের আলোচনার পর তিনি হরতাল বিষয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, এর মধ্যেও ওপরে তিন

নম্বরে উল্লেখিত আপত্তিটি রয়েছে। এবং যদি এই আন্দোলনে শরিক না হলে শারীরিকভাবে কষ্ট দেওয়া হয়, তাহলে এটি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেয়েও বড় অপরাধ। ইসলামের রুচি ও দাবির সাথে এ কোনোভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তা ছাড়া বয়কট ও হরতালে অংশ নিতে বাধ্য করার দ্বারা এই বলপ্রয়োগকারী লোকগুলো নিজেদের পছন্দ করা 'স্বাধীনতানীতি' নিজেরাই ভঙ্গ করে বসে আছে। আর না হয় নিজেদের জন্য স্বাধীনতা চাইতে গিয়ে অন্যের স্বাধীনতায় হাত দেওয়ার কী অর্থ![21]

তা ছাড়া হাকিমুল উম্মত রহ. হরতাল বিষয়ে *তালইনুল আরাইক* নামে স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকাও রচনা করেছেন। এখানে মূল আলোচনা যদিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বয়কট নিয়ে; কিন্তু এতে সাধারণ হরতাল বিষয়ে মৌলিক আলোচনাও পত্রস্ত হয়েছে। সেখানের শেষ কথাও এটিই—প্রচলিত হরতাল-পদ্ধতি শরিয়তবিরোধী এবং নাজায়েজ।[22]

আমরণ অনশন

এমনিভাবে দাবিদাওয়া আদায় করার জন্য আরেকটি বিশেষ পদ্ধতি পালন করা হয়—আমরণ অনশন। হাকিমুল উম্মত রহ. এ ব্যাপারে বলেন, গ্রেফতার হয়ে জেলে যাওয়ার পর অনেকে আমরণ অনশন শুরু করে। এটি করতে গিয়ে কেউ কেউ এমনকি জীবন

পর্যন্ত দিয়ে দেয় এবং জনগণ তাদের এই প্রাণ উৎসর্গের প্রশংসা করে।

হজরত থানবি রহ.-এর শরয়ি বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এ যে আত্মহত্যা এবং নাজায়েজ এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা নিজেদের হত্যা কোরো না। *হিদায়া* গ্রন্থের 'ইকরাহ' অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

فيأثم كما في حالة المخمصة সুতরাং, সে গুনাহগার হবে, যেমনটি হয় নিতান্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায়। এবং *ইনায়া* গ্রন্থে বলা হয়েছে :

فامتناعه عن التناول كامتناعه من تناول الطعام الحلال حتى تلفت نفسه أو عضوه فكان آثما.. الخ

সুতরাং, আহার থেকে বিরত থাকাটি হল হালাল খাবার থেকে বিরত থেকে মারা যাওয়া বা অঙ্গহানি ঘটানোর মতো। ফলে, সে গুনাহগার হবে...।

এই বিবরণ থেকে জানা গেল, জান বাঁচানো এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ যে, একদম নিরুপায় অবস্থায় যদি মারা যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় এবং মৃত জন্তু খেলে বেঁচে যাবে বলে মনে করে, তাহলে এমন সময়ে তা না খেয়ে মরে যাওয়া গুনাহের কাজ। সে জায়গায় হালাল খাবার না খেয়ে জীবন দিয়ে দেওয়া তো অবশ্যই গুনাহ। আর, এমন গুনাহের একটি কাজের প্রশংসা করলে তো ইমান চলে যাওয়ারই আশঙ্কা হয়। কারণ, এর দ্বারা স্পষ্টভাবেই শরিয়তকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়। কেননা শরিয়ত যে কাজকে

নিন্দনীয় বলেছে, প্রশংসাকারীরা একেই ভালো কাজ বলে প্রশংসায় মেতে উঠছে।[23]

অন্য এক জায়গায় বলেন, এই (আমরণ অনশন) আত্মহত্যার নামান্তর। এতে সত্যিই যদি মারা যায়, তাহলে সে মৃত্যু হারাম হবে।[24]

রাজনৈতিক পাবলিসিটির প্রচলিত রূপ

বর্তমান রাজনীতিতে পাবলিসিটি ও প্রোপাগান্ডা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পশ্চিমের বিখ্যাত রাজনীতিক গোয়েবলস-এর নীতিটি মান্য করা হয় : মিথ্যা খুব জোরেসোরে লাগাতার বলতে থাকো, মানুষ একসময় একে সত্য বলে ধরে নেবে।

বর্তমানের সরকার ও ধর্মহীন রাজনৈতিক দলগুলো তো এ নীতি অনুসরণ করছেই, কিন্তু দুঃখজনক হল অনেক সময় ইসলামিক দলগুলোও পরিবেশ-পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ নীতির ওপর উঠে আসছে। হয়তো তারা এর জায়েজ হওয়া না-হওয়া নিয়ে ভাবছেই না, অথবা এখানেও সেই চিন্তাটিই লালন করছে—রাজনীতিকে শুদ্ধ করার এ অভিযানে এমন ছোট ছোট বিষয়গুলো থেকে একটু-আধটু চোখ বন্ধ করে রাখতেই হবে।

মিথ্যা বলা তো হারামই। এ নিয়ে আর সন্দেহ কী! কিন্তু এ নিয়ে যেন কেউ ভাবছেই না। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য বৈধ কারণ ছাড়া গিবত করা, তাদের বিরুদ্ধে নাজায়েজ কথা বলা, অপবাদ

আরোপ করা, যাচাই না করেই প্রোপাগান্ডা ছড়ানো, বা তত্ত্বতালাশ না করে সেসব বিশ্বাস করা—এ সবকিছু আমাদের ইসলামিক দলগুলোর মধ্যেও প্রবেশ করে বসে আছে, সচেতনে বা অবচেতনে। পরিণতিতে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা, দলবাজি ও হানাহানি বাড়ছেই শুধু। হাকিমুল উম্মত রহ. বিভিন্ন বক্তব্যে এমন কর্মকাণ্ড নাজায়েজ ও অবশ্য পরিত্যাজ্য ঘোষণা করেছেন।

এমনিভাবে, সভাসমাবেশও জনগণ পর্যন্ত নিজেদের বক্তব্য পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু এখানেও অনেক সময় শরয়ি বিধিবিধানের তোয়াক্কা করা হয় না। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, যখন কোনো কৌশল কুরআন-হাদিসে বর্ণিত সুস্পষ্ট কৌশলের বিরুদ্ধে যায়, তখন তা তো নিষিদ্ধই। বিশেষ করে সেটি যখন অনর্থক ও ক্ষতিকর হয়, তখন তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কী সন্দেহ! এখানে তো 'শরিয়ত সমর্থিত প্রয়োজন নিষিদ্ধ কাজকে প্রয়োজন অনুপাতে বৈধ করে দেয়' মূলনীতিটিও প্রয়োগ হওয়ার সুযোগ নেই। যেমন হরতাল, সভাসমাবেশ। এগুলোতে অযথা সময় নষ্ট হয়, পয়সা খরচ হয়, দরিদ্র মানুষকে অন্যায় দুর্ভোগ পোহাতে হয়, নামাজের সময় পেরিয়ে যায়—কেউ টেরও পায় না। এত সব স্পষ্ট গুনাহের কাজ থাকার পরও তা কীভাবে জায়েজ হতে পারে? একজন জিজ্ঞেস করল, যদি এসবে অংশগ্রহণ করা দ্বারা হক

ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে? জবাবে তিনি বললেন, এসবের দ্বারা হক ও ইনসাফকে সাহায্য করা হয় না। দ্বিতীয় কথা হল—কোনো নাজায়েজ কাজ নিয়তের দ্বারা জায়েজ হয়ে যায় না।[25]

অন্য আরেক জায়গায় প্রচলিত রাজনৈতেক কর্মপন্থার ব্যাপারে নিজের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিটি আরও পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরেছেন। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—যারা সরকারের মোকাবেলা করতে যান, এরপর গ্রেফতারও হন, আবার পালটা কিছু করেনও না। এক ধরনের নীরব লড়াই। সরকার যদি জুলুম ও নিপীড়ন চালায়, তখনো পালটা প্রতিরোধের জন্য বিশেষ কিছু করে না। আগের মতোই—প্রতিবাদ করো, জেলে যাও, তারপর আবার প্রতিবাদ করো—এভাবে চলতে থাকে। এ ব্যাপারে শরিয়তের বক্তব্য কী?

জবাবে তিনি বলেছিলেন, আমাদের বিবেচনায় এখানে দুটো পথই শুধু দেখি : হয় মোকাবেলা করার শক্তি আছে, না হয় নাই। যদি শক্তি থাকে, তাহলে গ্রেফতার হবে কেন? তার জন্য উচিত জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই ও প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া। তা যদি না পারে, তাহলে বোঝাই যাচ্ছে এটা হল অক্ষমতা ও অপরাগতার কাল। এমন সময়ে স্বেচ্ছায় নিজেকে জুলুমের মুখে ফেলা, কারাগারে বন্দি হওয়া, শরিয়তে এসবের অনুমতি নেই; বরং এমন নিষ্ফল অক্ষম মোকাবেলার পরিবর্তে সবর করা উচিত। মোটকথা

দাঁড়াল এই—শক্তি থাকলে প্রতিরোধ করো, না থাকলে সবর করো। এর বাইরে তৃতীয় কোনো পথের কথা শরিয়তে বর্ণিত নেই।

সামনে গিয়ে বললেন, এই সময়ে মুসলমানদের ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় কারণ—তাদের নেতৃত্বে বড় কেউ নেই এবং কেন্দ্রীয় কোনো শক্তি নেই। আর হওয়া সম্ভবও নয়, যদি না ঘটনাক্রমে সকলে মিলে বড় কাউকে নেতৃত্বের আসনে বসায়। ইমাম ছাড়া কিছুই হবে না। এমন একজন ইমাম যদি মিলে যায়, সবই হবে। তার নির্দেশে ময়দানে যাবে, জান দিতে হলে দেবে, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এটা কেমন, প্রস্তুতি ছাড়া বসে থেকে হঠাৎ গিয়ে প্রাণ দিয়ে আসে? এটা কোনো মনুষ্যত্ব হল? সুতরাং, মূল কথা সেই ওপরেরটাই—সর্বোত্তম তিন যুগে যে পথটি অনুসরণ করা হয়েছে—শক্তি থাকলে লড়ো, না হয় সবর করো। বাকি সব মনগড়া পদ্ধতি। এজন্যই এসবে কোনো কল্যাণ হতে পারে না। আর কল্যাণ না থাকলে এসব পথে মুসলমান কখনো বাহ্যত সফল হলেও সে সফলতার কী দাম! আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টির বাইরে বাহ্যিক এ সফলতার কোনো মূল্য নেই। এমন অপূর্ণ সফলতা তো কাফেররাও পেতে পারে। মুসলমানদের সত্যিকারের সফলতা তো এটিই—গোলাম হয়ে থাকলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি নিয়ে থাকবে। যদি এমন হয়—রাষ্ট্রক্ষমতা পেলে, কিন্তু আল্লাহ সন্তুষ্ট হলেন না, তাহলে এ ক্ষমতা আর

ফেরাউনের রাজত্বে পার্থক্য রইল কই? সুতরাং, আল্লাহকে খুশি করার চেষ্টা করো, তাঁর সাথে সত্যিকারের সম্পর্ক তৈরি করো, ইসলাম ও শরিয়তের বিধিবিধান মেনে চলো। ওই সমস্ত মূর্তির পূজা তো অনেক হল, এবার আল্লাহর সামনে মাথা রেখেও দেখো কী হয়।[26]

শাসকদের সাথে আচরণ-পদ্ধতি

ইসলাম মূল জোরটি দিয়েছে এ কথার ওপর যে, মুসলমান যে অবস্থায়ই থাকুক, সবসময় শরিয়ত মেনে চলবে। যদি শাসকের পক্ষ থেকে শরিয়তের খেলাফ কোনো কাজের আদেশ জারি করা হয়, তাহলে তা মানা আবশ্যক নয়। সুস্পষ্টভাবে নিরুপায় হওয়ার আগ পর্যন্ত শরিয়ত মেনে চলতে হবে। তা মানতে গিয়ে যত কষ্টই হোক, সবর করবে। আল্লাহ তায়ালা তাকে এই সবরের প্রতিদান দান করবেন। এমনিভাবে শাসক যদি শরিয়তের খেলাফ কোনো কাজ করে, তাহলে সমস্ত শর্ত মেনে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে বারণ করার দায়িত্বটিও পালন করে যেতে হবে এবং প্রয়োজনের সময় তার সামনে সত্য প্রকাশের সৎ সাহসও দেখাতে হবে। হাদিস শরিফে একে 'সর্বোত্তম জিহাদ' আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ শরিয়তসম্মত, শর্ত হল শরিয়তের বেঁধে দেওয়া সীমানা লঙ্ঘন করা যাবে না। এ কাজের উদ্দেশ্য থাকবে একমাত্র আল্লাহ

তায়ালাকে সন্তুষ্ট করা এবং দীন ইসলামের প্রচার ও সাহায্য করা। শুধুমাত্র নিজের বাহাদুরি দেখানো, মানুষের হাততালি পাওয়া এবং নেতৃত্ব লাভ করার লোভ থাকলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

কিন্তু হাল জামানার রাজনীতির ময়দানে এ বিষয়টিতেও প্রচণ্ড প্রান্তিকতা দেখা যায়। সরকার দলীয় বা সরকারপন্থি মানুষেরা চোখ বন্ধ করে একচেটিয়া সরকারের প্রশংসা করে, ন্যায়-অন্যায় না দেখে সকল কাজেই সমর্থন জানায়, বিরোধীদের অন্যায়ভাবে দমনের কাজে সহযোগিতা করে। সরকারের নানা জুলুম-নির্যাতন দেখেও এ ব্যাপারে মুখে তালা লাগিয়ে বসে থাকে আর সাফাই গেয়ে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দাঁড় করে। এটা সুস্পষ্ট চাটুকারিতা। কেউ কেউ তো সরকারকে বাঁচাতে গিয়ে দীন বিকৃত করতেও পিছপা হয় না। অপরদিকে যারা বিরোধীদলীয় বা সরকারবিরোধী লোক, তাদের কাজের লক্ষ্যই পরিবর্তন হয়ে যায়। ন্যায় ও ইনসাফের বাস্তবায়ন নয়, সরকারবিরোধিতাই তাদের মূল কাজ। সরকারবিরোধিতা তাদের কাছে একটি রাজনৈতিক ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। তাদের বিশেষ দায়িত্বই হয়ে দাঁড়ায়—সরকার ভালোমন্দ যা-ই করুক আমাদের বিরোধিতা করতে হবে। তাদের কোনো ভালো কাজের স্বীকৃতি দিতে মোটেও প্রস্তুত নয়।

এসব করার দ্বারা বেশির ভাগ সময় তাদের মূল লক্ষ্যই থাকে নিজেদের জন্য নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়া

এবং জনগণ থেকে বাহবা অর্জন করা। জনগণের মধ্যে এটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা সুযোগ পেলেই সরকারকে গালি দেয়, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, বদনাম করে। সভাসমাবেশে সরকারদলীয় নেতাদের এমনকি কুকুর-শুকর বানিয়ে তাদের বিরুদ্ধে তুমুল স্লোগান তোলা হয়। রাজনৈতিক সমাবেশে আয়োজন করে শাসকদের কথা ওঠানো হয়, এরপর তাদের বিরুদ্ধে শুরু হয় নিন্দা আর গালমন্দের ঝড়। বৈধ কোনো কারণ না থাকায় এটি গিবত তো হয়ই, অনেক সময় মিথ্যা অপবাদ পর্যন্ত গিয়ে গড়ায়। কিন্তু সবাই ধরে নেয় ফাসেক শাসকদের নিন্দা করা গিবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। হাকিমুল উম্মত রহ. এই কর্মপদ্ধতির সমালোচনাও করেছেন।

তিনি বলেন, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এই উম্মতের সবচেয়ে বড় প্রসিদ্ধ জালেম। কিন্তু এক বুজুর্গের মজলিসে একজন তার ওপর একটি মিথ্যা অপবাদ দিলে তিনি নাখোশ হয়ে বললেন, সে যদিও জালেম ও ফাসেক; কিন্তু তার সাথে আল্লাহ তায়ালার আলাদা কোনো দুশমনি নাই। তিনি যেমনিভাবে হাজ্জাজ থেকে অন্য মজলুমদের প্রতিশোধ নেবেন, তেমনই হাজ্জাজের ওপর জুলুম হলে এর বিচারও তিনি করবেন।[27]

এ ছাড়াও হজরত থানবি রহ. কয়েক জায়গায় পরিষ্কার বলেছেন, প্রয়োজন ছাড়া প্রকাশ্যে শাসকদের অপমান করা শরিয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়।

তিনি বলেন, ইসলামি শাসকদের প্রকাশ্যে অপমান করলে জনগণের ক্ষতি হয়। সরকারের ভাবগাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে গেলে দেশে নানা ফেতনা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এজন্য তাদের সম্মান করা উচিত।[28]

হাকিমুল উম্মতের এই কথাটি মূলত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিসের ব্যাখ্যা। হজরত ইয়াদ ইবনে গুনম রা. বর্ণনা করেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো ক্ষমতাবান বা নেতৃত্বস্থানীয় লোককে নসিহত করতে চায় সে যেন তা প্রকাশ্যে না করে; বরং, সে তার হাত ধরে গোপন কোথাও নিয়ে যাক, এরপর সে যদি নসিহত কবুল করে, তাহলে তো ভালো; অন্যথায় সে তার দায়িত্ব আদায় করেছে।[29]

অন্য আরেক বয়ানে তিনি বলেন, অনেক মানুষ বিপদাপদে নিরাশ ও হতোদ্যম হয়ে সরকারকে গালমন্দ করতে শুরু করে। এটিও ধৈর্যহীনতার পরিচয়। পছন্দনীয় কোনো আচরণ নয়। হাদিস শরিফেও এটি করতে নিষেধ করা হয়েছে। নবিজি বলেছেন, তোমরা শাসকদের গালি দিয়ো না। তাদের হৃদয় আমার (আল্লাহর) হাতে। আমার অনুগত হয়ে চলো, আমি তাদের হৃদয় তোমাদের ওপর নরম করে দেব।[30]

যে হাদিসের দিকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন, এটি বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন।

আয়েশা রা.-এর বর্ণনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে—নিজের শাসককে গালমন্দ করার কাজে লেগে থেকো না; বরং তাদের জন্য দোয়া ও আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জন করো, তিনিই তাদের হৃদয় তোমাদের জন্য রহমপূর্ণ করে দেবেন।

আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন : আমি আল্লাহ। আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি সমস্ত জাহানের অধিপতি, বাদশাদের বাদশা। সকল শাসকের অন্তর আমার হাতে। বান্দারা যখন আমার বাধ্য হয়ে থাকে, আমি বাদশাদের হৃদয়ে তাদের প্রতি মমতা ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিই; কিন্তু তারা যখন আমার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়, আমি শাসকদের হৃদয়ে তাদের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা ঢেলে দিই। ফলে, তারা তাদের নিষ্ঠুর নির্যাতন করতে শুরু করে। সুতরাং, বাদশাদের বিরুদ্ধে বদ দোয়ায় মত্ত হয়ে পোড়ো না; বরং বিগলিত হয়ে আমার স্মরণে আত্মনিয়োগ করো, আমি তোমাদের জালেম শাসকদের হাত থেকে উদ্ধার করব।[31]

হজরত আবু উমামা রা. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে—শাসকদের তোমরা গালমন্দ কোরো না; বরং তাদের জন্য সংশোধনের দোয়া করো। কেননা তারা সংশোধিত হলে তোমরাও সংশোধিত হবে।[32]

যা-ই হোক, প্রয়োজন ছাড়া অযথাই শাসকদের নিন্দা করাকে নিজের বিশেষ কাজ বানিয়ে নেওয়া শরিয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়। তারা যদি সীমালঙ্ঘন করে এত দূর চলে যায় যে, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ হয়ে পড়ে, তাহলে শরিয়তের বিধিবিধান ও নির্দেশনা মেনে বিদ্রোহ করা উচিত। (এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণটি ইনশাআল্লাহ সামনে আসছে।) কিন্তু নিয়ম করে ক্রমাগত নিন্দা করে যাওয়াকে নিষেধ করা হয়েছে। গিবতের গুনাহ তো আছেই, আরও একটি হেকমতের দিকে থানবি রহ. ইশারা করেছেন—ভালোমন্দ যা-ই হোক, দেশের ভেতরে শেষ পর্যন্ত সরকারের একটা ভাবমূর্তি টিকে থাকা জরুরি। অন্যথায় সমাজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক শক্তি, নানা অপরাধী সংঘ একসাথে জেগে উঠে পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে এবং গণমানুষের নিরাপত্তা ও জীবন বিপন্ন হবে।

ইসলামবিরোধী আইন ও শরিয়তবিরোধী পদক্ষেপে করণীয়

এখানে স্বাভাবিকভাবে একটা প্রশ্ন আসবে—সরকারের শরিয়তবিরোধী আইন ও অবস্থানের বিরুদ্ধে যদি হরতাল, ধর্মঘট ও হালে প্রচলিত অন্যান্য বিষয়গুলো বাদ দিতে হয়, তাহলে আমাদের করণীয় কী? শরিয়তবিরোধী আইনকানুন যাচ্ছেতাই করার জন্য

সরকারকে সরকারের পথে ছেড়ে দেব? জনগণকে ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষা থেকে ফিরিয়ে বদ-দীন বানানোর জন্য সরকার নিজের প্ল্যান-প্রোগ্রাম স্বাধীনভাবে বাস্তবায়ন করতে থাকবে, স্কুল কলেজ মিডিয়া ইত্যাদি ব্যবহার করে ইসলামবিরোধী মতবাদ চারদিকে ছড়িয়ে দেবে, আর আমরা যারা দীন মেনে চলতে চাই, তারা স্রেফ মৌখিক ওয়াজ-নসিহত করে চুপচাপ বসে থাকব? অথচ পরিষ্কারভাবেই জানি মুখের কথায় সরকার বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করে না এবং নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করার আগ পর্যন্ত কোনো দাবি-দাওয়া মানতে চায় না!

হাকিমুল উম্মত রহ.-এর বক্তব্যের আলোকে এই প্রশ্নের জবাব হল—পশ্চিমা রাজনীতির প্রভাবে আমরা ধরেই নিয়েছি হরতাল ধর্মঘট ইত্যাদি ছাড়া প্রতিবাদের কোনো পথই নেই। অথচ পশ্চিমা সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে প্রত্যেকের উচিত প্রতিবাদের পদ্ধতি ও ভাষা নিজেদের শরিয়ত থেকে গ্রহণ করা। এ জায়গায় শরিয়তের নির্দেশনাটি কী?

তিনি বলেন, সরকার যদি শরিয়তের বিরোধিতা করে সশস্ত্র বিদ্রোহ বৈধ হওয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে সেখানে তো বিদ্রোহ বৈধতার বিধান চলে আসবে। (বিস্তারিত বিবরণ সামনেই আসছে) কিন্তু যেখানে বিদ্রোহ বৈধ হবে না, সেখানে ওয়াজ-নসিহত ছাড়াও মুসলমানদের আরও বড় একটি অস্ত্র হল—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিস :

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

অর্থাৎ, আল্লাহর নাফরমানির বিষয়ে বান্দার আনুগত্য করা বৈধ নয়। এই পদ্ধতি বড় বড় সরকারকেও পিছু হটতে বাধ্য করে।

এ পদ্ধতি স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনার আলোকে প্রমাণিত। হজরত মুআজ ইবনে জাবাল রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ভাতা যতক্ষণ পর্যন্ত ভাতা হিসেবে বহাল থাকবে, ততক্ষণ তা গ্রহণ করো; কিন্তু যখন তা দীন বিক্রির ঘুষে পরিণত হবে, তখন আর গ্রহণ করবে না। কিন্তু আমি জানি, তোমরা দারিদ্র্যের ভয় ও প্রয়োজনের তাড়নায় একে ছাড়বে না। খুব ভালোভাবে শুনে নাও, ইসলামের চাকা ঘুরতে শুরু করেছে, এজন্য কুরআন যেখানে যাবে তোমরাও তার সাথে সেখানে যেয়ো। খবরদার! অচিরেই কুরআন ও শাসন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এমন পরিস্থিতিতে তোমরা কুরআন ছাড়বে না। মনে রেখো, তোমাদের মাথার ওপর এমন কিছু শাসক আসবে, যারা নিজেদের ব্যাপারে যে ফায়সালা করবে তোমাদের জন্য তা করবে না। যদি এর বিরোধিতা করো তাহলে তোমাদের হত্যা করবে, আর যদি আনুগত্য করো তাহলে পথভ্রষ্ট করে দেবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, এ অবস্থায় আমরা কী করব? তিনি বললেন : ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালামের সাথিদের সাথে যা করা হয়েছে

তোমরাও সেই ভাগ্য বরণ করে নিয়ো। তাদের চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো হয়েছে এবং জ্বলন্ত কাঠের শূলীতে চড়ানো হয়েছে। আল্লাহর আনুগত্য করতে গিয়ে যদি মৃত্যু এসে যায়, তাহলে আল্লাহর নাফরমানিতে জীবন কাটানোর চেয়ে মৃত্যুই উত্তম।[33]

এই হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, যদি সরকারের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট কুরআনবিরোধী কোনো আইন জারি করা হয়, তাহলে একজন মুসলমানের দায়িত্ব হল সেদিকে না তাকিয়ে আল্লাহর বিধানটিই মেনে চলা। এ পদ্ধতি একদিকে যেমন দুনিয়া ও আখেরাতের নাজাতের পথ, অপরদিকে এতে রয়েছে সমাজ সংশোধনের বিরাট সম্ভাবনা। কারণ, জনগণের মধ্যে যদি ব্যাপকভাবে দীনি এই চেতনাটি ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা শরিয়তবিরোধী আইন মানা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, তাহলে একটি সরকারের ওপর এর চেয়ে বড় চাপ আর কিছু দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে না। ভেবে দেখুন, প্রত্যেক মুসলমান যদি সিদ্ধান্ত নেয় সুদি ব্যাংকে কোনো অ্যাকাউন্ট খুলবে না, চাকরিজীবীরা সেখানে চাকরি করা ছেড়ে দেয়, ব্যবসায়ীরা সুদি লোন নেওয়া পরিত্যাগ করে, তাহলে এই সুদি ব্যাংকগুলো কি একদিনও টিকতে পারবে?

এমনিভাবে যদি বিচারক সিদ্ধান্ত নেন ইসলামবিরোধী আইন দিয়ে তারা একটি বিচারও করবেন না, এর জন্য যদি চাকরি ছাড়তে হয় ছাড়বেন, আইনজীবীরা সিদ্ধান্ত নেন তারা

অনৈসলামিক আইনব্যবস্থার অধীনে একটি মামলার শুনানিতেও অংশ নেবেন না, এর কারণে যত পয়সাই হাতছাড়া হোক, তাহলে এই অনৈসলামিক বিচারব্যবস্থা কয়দিন থাকতে পারবে? মুসলিম সরকারী চাকরিজীবীরা যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন তারা সরকারের ইসলামবিরোধী কোনো পদক্ষেপে কোনোভাবেই অংশ নেবেন না, যদি অংশ নিতে বাধ্য করা হয় তারা চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে কুণ্ঠিত হবেন না, তাহলে ইসলামবিরোধী পদক্ষেপগুলো সফল হতে পারবে?

প্রতিবাদের এই পদ্ধতিতে সমস্যা কোথায়? সমস্যা একটাই—এটি পশ্চিমের টাকশাল থেকে তৈরি হয়ে আসেনি। এ কারণে সবার কাছে কেমন অস্বস্তিপূর্ণ মনে হবে। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে একে যদি বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে এটি দেশের পুরো সিস্টেম বদলে দিতে সক্ষম, পাশাপাশি এতে সে দুর্যোগগুলো নেই, যেগুলো হরতাল-অনশনের মধ্যে রয়েছে। শুধু এটুকু প্রয়োজন—ইসলামি শাসন বাস্তবায়নের জন্য যারা দৌড়ঝাঁপ করছেন, তাদের হৃদয়ে আল্লাহভীতি, আখেরাতের ফিকির, আল্লাহ তায়ালার সামনে জবাবদিহিতার ভয় এবং শরিয়ত মেনে চলার নিখাদ আবেগ থাকতে হবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হল, প্রথমে নিজেরা ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামি অনুশাসন মেনে চলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

এর বিপরীতে প্রচলিত পদ্ধতির প্রতিবাদ মানুষের কাছে সহজ মনে হয়, কারণ এতে সবার আগে নিজের জীবনে ইসলাম পালনের শর্ত নেই। যার জীবনে এমনকি ইসলামি মৌলিক বিষয়গুলোও অনুপস্থিত সেও পর্যন্ত ইসলাম কায়েমের ঝান্ডা উঁচিয়ে স্লোগানে স্লোগানে রাজপথ কাঁপিয়ে তোলে। এ পথে নিজের দীনি চেতনা জাহির করার জন্য একদিন হরতাল পালনে অংশ নেওয়াই যথেষ্ট। এর আগেপরে সবসময় নিজের দোকানে অফিসে যদি নির্ভেজাল শরিয়তবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকে, তাহলেও সে 'ইসলামি আন্দোলনে' কোনো সমস্যা হয় না।

অথচ, বিস্ময়ের কথা হল যে নিজের জীবনে ইসলামের বিধানাবলি কার্যকর করতে পারে না, সে কীভাবে আশা করে ইসলামের জন্য তার এই সব দৌড়ঝাঁপ আর দাবি-দাওয়া ইসলামের বিজয় ছিনিয়ে আনবে? অন্তত এটুকু শর্ত তো থাকা দরকার, যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবে, সবার আগে তার নিজের জীবনকে ইসলামের আদলে গড়ে তুলতে হবে এবং এই পথে জানমাল স্বার্থ ও বিচার-বিবেচনাহীন জোশ-জজবা, প্রবৃত্তিপ্রভাবিত অন্য সব চিন্তা-চেতনা কুরবানি করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। এই মূল শর্তটিই যদি গায়েব হয়ে যায়, তাহলে ইসলাম কায়েম করার জন্য এই সব চেষ্টা ও পরিশ্রমের মূল্য কী? নিষ্প্রাণ ভাসাভাসা এক হট্টগোল ছাড়া কিছুই নয়।

সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামি হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে ভয়ানক অপরাধ আখ্যায়িত করেছেন, এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ ব্যাপারে সকল ফকিহ একমত।

একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে কখন বিদ্রোহ করা জায়েজ—এ বিষয়ে ফিকহের গ্রন্থগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত নানা হাদিস থেকে এ কথা পরিষ্কার—কোনো শাসকের দিক থেকে যখন সুস্পষ্ট কুফরি প্রকাশিত হয়, তখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বিলকুল জায়েজ। কিন্তু যদি সে ফাসেকি ও পাপাচারে লিপ্ত হয়, তাহলে সাধারণত ফফিহগণ বিদ্রোহ বৈধ বলেন না। কারণ, হাদিসে শুধুমাত্র স্পষ্ট কুফরি পেলে তবেই বিদ্রোহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কিছু হাদিসে কিছু কিছু শব্দ এর বিপরীত ধারণাও দেয়। মনে হয় যেন পাপাচারে লিপ্ত হলেও বিদ্রোহ করার সুযোগ আছে। এ কারণে কোনো কোনো ফকিহও ভিন্নরকমের মতামত দিয়েছেন। একটা সময় পর্যন্ত স্বয়ং লেখকেরও এ ব্যাপারে অস্পষ্টতা ছিল। পরিষ্কার কোনো কথা সামনে আসছিল না।

হাকিমুল উম্মত রহ. এ বিষয়ে সমৃদ্ধ একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। অত্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণাদির আলোকে সুবিস্তারিত আলোচনা। পুস্তিকাটি *ইমদাদুল*

ফাতাওয়ার ৫ম খণ্ডে *জাজলুল কালাম ফি আজলিল ইমাম* শিরোনামে ছাপা হয়েছে। এতে তিনি সংশ্লিষ্ট সকল হাদিস একত্র করেছেন, এনেছেন ফকিহদের সব ধরনের বক্তব্য, এরপর চমৎকার বিশ্লেষণের সাথে সম্ভাব্য সকল পরিস্থিতি আলাদা করে দেখিয়ে সবগুলোর বিধান উল্লেখ করেছেন—হাদিস ও ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে। আমার দেখামতে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে তাঁর পুস্তিকাটিই সবচেয়ে সুন্দর ও শক্তিশালী। এর মতো দ্বিতীয়টি পাইনি।

তার সে আলোচনার শেষ কথাটি হল—সরকারের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের বেশ কিছু ভাগ আছে। স্বাভাবিকভাবেই সবগুলোর বিধান এক নয়; আলাদা।

1. শাসক এমন অন্যায় ও গুনাহের কাজে লিপ্ত, যেগুলো তার নিজের মধ্যেই সীমিত থাকে, জনগণকে আক্রান্ত করে না। যেমন, মদ খাওয়া ইত্যাদি।

এর বিধান হল—যদি কোনো ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হওয়া ছাড়া সহজেই অপসারণ করা সম্ভব হয়, তাহলে সরিয়ে দেওয়া হবে; অন্যথায় ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। ... এবং ক্ষমতাচ্যুত করা বৈধ নয়—এমন পরিস্থিতিতে কেউ যদি সশস্ত্র বিদ্রোহ করে বসে, তাহলে পেছনে যে ষষ্ঠ নম্বর বক্তব্যে বলা হয়েছে : সুতরাং যদি মুসলমান কোনো দল সশস্ত্র বিদ্রোহ করে..., সে আলোকে সকল মুসলমানের উচিত

9:14 PM

—শাসকের পক্ষে দাঁড়ানো। বিশেষ করে শাসক যখন নির্দেশ দেবে, তখন সবাইকে সে নির্দেশ পালন করতে হবে।

2. শাসকের অপরাধ অন্যকেও আক্রান্ত করে। যেমন, জনগণের সম্পদ অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নিতে লাগল। কিন্তু পুরোপুরি ছিনিয়ে নেওয়াও বলা যায় না; বৈধ হওয়ার একটু সম্ভাবনাও আছে। ধরা যাক, রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ও উন্নয়নের কথা বলে ট্যাক্স নিল—এমন হলেও সশস্ত্র বিদ্রোহ করা যাবে না।
3. কিন্তু যদি বৈধতার কোনো সম্ভাবনাও না থাকে, তাহলে এর বিধান হল জনগণ নিজের ওপর হওয়া জুলুম প্রতিহত করবে, এতে যদি যুদ্ধও করতে হয়, করতে পারবে। এমতাবস্থায় যুদ্ধ না বাধিয়ে ধৈর্য ধরে থাকাও জায়েজ; বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সার্বিক বিবেচনায় ধৈর্যধারণই অধিক উত্তম।
4. জনগণকে গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করে, তবে এর দ্বারা দীনকে হেয় করা উদ্দেশ্য নয়, বা কুফরিকে ভালোবাসার কারণে নয়; বরং এমনিতেই নিজের প্রবৃত্তির বশে বা আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, তাহলে এমতাবস্থায় বিধান

হল—জনগণকে মাজুর বা অক্ষম বিবেচনা করা হবে এবং ফিকহের গ্রন্থগুলোতে মাজুর ব্যক্তিদের যে বিস্তারিত বিধান উল্লেখ আছে, সেগুলো জারি হবে। কিন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহ বৈধ হবে না।

5. জনগণকে গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করে এবং এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হল দীনকে হেয়প্রতিপন্ন করা বা কাজটা সে করে গুনাহ ও কুফরকে ভালোবাসার কারণে, তাহলে তা কুফর বলে বিবেচিত হবে। এমনও হতে পারে মানুষকে গুনাহের কাজে বাধ্য করার দ্বারা উপস্থিত সময় হয়তো দীনকে হেয় করা তার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু কাজটা সে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এত ব্যাপকভাবে শুরু করল যে, এভাবে চলতে থাকলে একসময় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মানুষের মনে দীনের প্রতি হেয়তা সৃষ্টি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তখনো একে কুফর হিসেবেই বিবেচনা করা হবে। এ সকল অবস্থায় স্পষ্ট কুফরি করলে যে বিধানাবলি আরোপ হয় এখানেও তা-ই হবে। সুস্পষ্ট কুফরির বিধানটি ষষ্ঠ নম্বরে উল্লেখ করা হচ্ছে।

6. আল্লাহ না করুন, শাসক যদি কাফের হয়ে যায়, তাহলে এ পরিস্থিতির বিধানগুলো নিম্নরূপ :

সাথে সাথে পদচ্যুত হবে। যদি ক্ষমতা না ছাড়ে তাহলে তাকে জোরপূর্বক ক্ষমতাচ্যুত করা সকলের ওপর ওয়াজিব, শর্ত হল এর জন্য সামর্থ্য থাকতে হবে। এ সময় খুব গুরুত্বের সাথে কয়েকটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে : কুফরি কর্মটি সকলের ঐকমত্যে কুফরি হতে হবে। এমনিভাবে তার থেকে কুফরি প্রকাশ হওয়ার বিষয়টিও সচক্ষে দেখার মতো নিশ্চিত হতে হবে; শোনা কথায় প্রমাণিত হবে না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য থেকে এমনটিই প্রমাণিত। তিনি বলেছেন : إلا أن تروا যদি না তোমরা দেখতে পাও... এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সচক্ষে দেখা। কারণ, ক্রিয়াটি এখানে একটিমাত্র কর্মযোগে ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো কুফরি কাজ শাসকের কাফের হওয়ার প্রতি নির্দেশ করা বা কুফরি কর্ম প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি পরিস্থিতি ও বক্তব্যসংক্রান্ত আলামতের ভিন্নতার কারণে মতপার্থক্যপূর্ণ হতে পারে। মতবিরোধপূর্ণ হতে পারে স্বয়ং অকাট্য কোনো বিধানও। কখনো ইজমাতেও দেখা দিতে পারে মতভিন্নতা। এ সকল অবস্থায় সে কাজে লিপ্ত ব্যক্তি অজুহাত প্রদর্শনের সুযোগ পাবে।

> এমনিভাবে অন্য আরেকটি সময়েও মতপার্থক্য বিবেচ্য ও গ্রহণযোগ্য হবে। তা হল—পঞ্চম উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে দুটো কল্যাণের মধ্যে যখন বিরোধ দেখা দেবে, সবচেয়ে কম ক্ষতিকর ও তুলনামূলক বেশি লাভজনক বিষয়টিকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে—সে আলোকে বলা যায়, সে কল্যাণ কোনটি তা নির্ধারণ নিয়ে দুজন বিশেষজ্ঞের মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। এ কথাটি সকলেই মেনে নিলে নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের মধ্যেও যে নানা মতবিরোধ পাওয়া যায়, সেগুলোর সুষ্ঠু নিরসন হয়ে যায়।[34]
>
> অতঃপর, যে সকল অবস্থায় সশস্ত্র বিদ্রোহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে বা ওয়াজিব বলা হয়েছে, সে সময়েও শর্ত হল বিদ্রোহের জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্য বিদ্যমান থাকতে হবে এবং এ বিদ্রোহের ফলে এর চেয়েও নিকৃষ্ট কোনো শাসক ক্ষমতায় বসা বা কোনো অমুসলিম শাসক রাষ্ট্র দখলে নেওয়ার আশঙ্কা না থাকতে হবে।

এখানে আমরা হজরত থানবি রহ.-এর গবেষণা ও বিশ্লেষণের সংক্ষিপ্ত সারনির্যাস পেশ করলাম শুধু। তার মূল আলোচনা এত সংক্ষিপ্ত নয়; বরং প্রতিটি অংশ হাদিস ও ফিকহের শক্তিশালী দলিল-প্রমাণ দিয়ে অত্যন্ত মজবুতভাবে আলোচনা করেছেন। সাথে সমস্ত

উহ্য প্রশ্ন ও সংশয়ের নিরসনও করেছেন। গবেষক ও জ্ঞানী মানুষদের জন্য এ পুস্তিকাটি অত্যন্ত উপকারী ও প্রশান্তদায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।[35] •

ইসলামি হুকুমত কায়েমের নামে

শরিয়তের বিধান লঙ্ঘন ও একটি পর্যালোচনা

প্রশ্ন : সমকালে অনেক রাজনৈতিক দলকে দেখা যায় একদিকে দাবি করছেন তারা ইসলামি হুকুমত কায়েম করার চেষ্টায় আছেন, অপরদিকে নেতৃবৃন্দ ও সদস্যবর্গ শরিয়তের সীমালঙ্ঘন করে নানা ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন। এ নিয়ে তাদের কোনো অনুতাপ নেই, উলটো কর্মকৌশল, বিশেষ কল্যাণ, রাজনীতি ইত্যাদি শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করে জায়েজ প্রমাণের চেষ্টা করেন। এক হাদিসে নাকি আছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরিফের যে অংশটি চার দেয়ালের বাইরে থেকে গিয়েছিল, সেটুকুকে ভেতরে নিয়ে ঘরটি পুনঃনির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু মানুষের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে ফেতনা ছড়াতে পারে আশঙ্কায় এ থেকে বিরত থেকেছিলেন। সে সময় আফসোস করে

একজনকে বলেছিলেন—তোমার গোত্রের লোকজন যদি সদ্য ইসলামগ্রহণকারী না হত, তাহলে আমি এ অংশটুকু ভেতরে নিয়ে কাবাকে নতুন করে নির্মাণ করতাম। তারা নিজেদের শরিয়ত লঙ্ঘনের পক্ষে এই হাদিস দিয়ে দলিল দেন। তাদের এই চিন্তা এবং এর পক্ষে প্রমাণ হিসেবে যা পেশ করেছেন, তা কি সঠিক? আশা করছি বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে জাতিকে সঠিক পথের দিশা দেখাবেন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

উত্তর : এ তো সকলেই জানে—জাগতিক কোনো স্বার্থ হাসিলের জন্য গুনাহের কাজ করা বা কোনো ফরজ ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া বিলকুল জায়েজ নেই। ধরা যাক, এক লোক পার্থিব কোনো স্বার্থ হাসিলের জন্য মিথ্যা বলতে শুরু করল বা মানুষকে ধোঁকা দিতে লাগল অথবা নামাজ ছেড়ে দিল কিংবা নামাজের জামাতে যাওয়া বন্ধ করে দিল; তার এসব কাজ যেকোনোভাবেই জায়েজ নয়; বরং সম্পূর্ণ নাজায়েজ ও হারাম—এ কথা সবাই বোঝে। দলিল দিয়ে বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না। তেমনই কোনো দীনি কল্যাণ লাভের জন্যও এ ধরনের গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ নেই। সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণ পার্থিব-অপার্থিব সকল কল্যাণের আগে; বরং এটিই সমস্ত কল্যাণের উৎস ও কেন্দ্রস্থল। এর সামনে

যেকোনো লাভ-লোকসানের সমস্ত হিসাব তুচ্ছ ও গৌণ।

কেউ যদি মাদরাসা চালানোর জন্য সিনেমার ব্যবসা করে বা সুদি কারবার করে টাকা উপার্জন করে, অথবা ধরা যাক, নাচগানের আসর বসাল এ উদ্দেশ্যে যে, কিছুক্ষণ গান শোনানোর পর যখন অনেক মানুষ জমে যাবে, তখন সবাইকে দীনি আলোচনা শুনিয়ে দেবে—একে কি জায়েজ বলা যাবে? কখনোই না। শক্ত গুনাহ ও শয়তানের কুমন্ত্রণা। দীনি কাজের নামে বিভ্রান্তি ও সুস্পষ্ট গোমরাহি।

অবশ্য, কোনো কাজ যদি এমন হয় যে, এটি ফরজ-ওয়াজিব কিছুই না; স্রেফ বৈধ বা মুস্তাহাব, এমন পর্যায়ের কোনো কাজ দীনি কোনো কল্যাণের জন্য ছেড়ে দেওয়া জায়েজ আছে। দীনি কল্যাণ, যথা —জনসাধারণকে ফেতনা থেকে বাঁচানো বা তাদের কোনো কষ্ট লাঘব করা কিংবা গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখা ইত্যাদি। ফিকহের কিতাবে এরকম দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন, ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, মুসল্লিরা ক্লান্তি বোধ করলে তারাবির নামাজের বৈঠকে দরুদ শরিফ সংক্ষিপ্ত করা এবং শেষের দোয়া মাসুরা না পড়া জায়েজ আছে।

এ মাসআলার সূত্রে আল্লামা হাসকাফি রহ. বলেন, ইমাম তাশাহহুদের পর আরও কিছু দোয়া-দরুদ পড়বে। তবে মুসল্লিরা ক্লান্ত হলে শুধু দরুদ শরিফ পড়বে। তা-ও সবটুকু না পড়ে কেবল 'আল্লাহুম্মা

সাল্লি আলা' পড়বে, এরপর আর কোনো দোয়া না পড়েই সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করে দেবে। ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মতে দরুদ শরিফ থেকে কমপক্ষে এতটুকু পড়া ফরজ। তাই সতর্কতাবশত এ অংশটুকু পড়তে হচ্ছে।[36]

তবে, বিশেষ কোনো কল্যাণের কথা বিবেচনা করে কোনো মুস্তাহাব বা বৈধ বিষয়কে বাদ দিতে হলেও একটি শর্ত আছে। আর তা হল, এই বাদ দেওয়ার কারণে শরিয়তের কোনো বিধানে বিকৃতি ঘটতে পারবে না, এমনিভাবে লক্ষ রাখতে হবে এর দ্বারা যেন শরিয়তের মধ্যে হস্তক্ষেপ হওয়ার ঘটনা না ঘটে। যেমন, বৈধ বা মুস্তাহাব কাজটি এমন আঙ্গিকে বাদ দেওয়া হল যে, একপর্যায়ে মানুষ একে হারাম ভাবতে শুরু করল। অথবা হারাম মনে করে না ঠিক, কিন্তু এর সাথে আচরণ করে হারাম কাজের মতোই। অথবা ধরা যাক, শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কোনো বিষয় নিষিদ্ধ করে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন জারি করা হল। বিশেষ কল্যাণের দোহাই দিয়ে এসবের কিছুই করা যাবে না। করলে তা হবে শরিয়ত বিকৃতি ও শরিয়তে হস্তক্ষেপ করার নামান্তর।

এ থেকে বোঝা গেল বিশেষ কোনো কল্যাণের দোহাই দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে বা বাল্যবিয়ের বিরুদ্ধে আইন করা জায়েজ নেই, যদিও এ দুটোর কোনোটিই ফরজ-ওয়াজিব কিছু নয়; বৈধমাত্র। কারণ, বিয়ে একটি শরিয়তঘনিষ্ঠ বিষয় এবং শরিয়ত একে

জায়েজ বলেছে। কিন্তু আইন করে নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে মূলত শরিয়তের বিপরীতে গিয়ে একে হারাম ঘোষণা করা হচ্ছে। এটাই দীন ও শরিয়তের মধ্যে হস্তক্ষেপ। এ কাজ কোনোভাবেই জায়েজ হতে পারে না। কিন্তু নিছক ব্যবস্থাপনাগত কোনো বিষয়ে যদি আইন জারি করা হয়, তাহলে এর সুযোগ আছে। যেমন, রাস্তায় শুধু ডান বা বাম দিক ধরে চলার আইন করা অথবা কোনো রাষ্ট্রের ট্রাফিকব্যবস্থার সুবিধার জন্য সে দেশের রোডগুলোকে ওয়ানওয়ে রোড হিসেবে ঘোষণা করা ইত্যাদি—এ জাতীয় সাধারণ আরও যত ট্রাফিক আইন আছে, এসবে কোনো আপত্তি নেই। অথবা ধরা যাক, কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার স্বার্থে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য পায়জামা পরা বাধ্যতামূলক করে লুঙ্গি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিল। শরিয়তের দৃষ্টিতে এতেও আপত্তি নেই। কারণ, এ বিষয়গুলো শরিয়তগত কোনো বিষয় নয়, ফলে এখানে কোনো রদবদল শরিয়তের মধ্যে রদবদল হিসেবে বিবেচিত হবে না।

প্রশ্নের মধ্যে কাবা শরিফ নির্মাণের যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, তা ছিল সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনাগত একটি বিষয়, শরিয়তের দৃষ্টিতে ফরজ-ওয়াজিব কিছু ছিল না। এমনকি মুস্তাহাব বলাও মুশকিল। কারণ, হাতিমকে কাবার চার দেয়ালের ভেতর নিয়ে যাওয়া, দরজা নিচে নামানো, একটির পরিবর্তে দরজা দুটো বানানো—এ কাজগুলোর মধ্যে মুস্তাহাব হওয়ার মতো

কোনো কারণ উপস্থিত নেই। এগুলো স্রেফ ব্যবস্থাপনাগত বিষয়। আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্ন। বড়জোর এটুকু বলা যায়—এর কারণে ইবাদতের মধ্যে একটু সহজতা সৃষ্টি হত, তাই পরোক্ষ মুস্তাহাব। এগুলোকে যদি সরাসরি মুস্তাহাবও ধরা হয়, যেমন হাতিমকে কাবার ভেতরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি বাহ্যত এমনই মনে হচ্ছে, তাহলেও এর দ্বারা শুধু এতটুকু প্রমাণিত হয়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎকালীন নওমুসলিম লোকদের ফেতনা থেকে বাঁচিয়ে তাদের ইমান হেফাজত করার জন্য একটি মুস্তাহাব কাজ ছেড়ে দিয়েছেন; কিন্তু এই ঘটনা দ্বারা এটা কীভাবে প্রমাণ করা সম্ভব যে, বিশেষ কোনো কল্যাণের খাতিরে রীতিমতো ফরজ-ওয়াজিব পরিত্যাগ করা এবং বিভিন্ন পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া জায়েজ?

এজন্যই আমরা দেখি হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এই ঘটনাটির উপসংহার টেনে বলেন, কোনো বিষয় মৌলিকভাবে অনুত্তম হলেও জনগণের কল্যাণের খাতিরে শাসক তা বাস্তবায়ন করতে পারবে, তবে অবশ্যই হারাম কিছু হতে পারবে না।[37]

ইমাম বুখারি রহ.-ও এ হাদিসকে কেন্দ্র করে সে অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে—যে ব্যক্তি 'মানুষ না বুঝে ফেতনায় নিপতিত হবে এই ভয়ে উত্তম কোনো বিষয় বর্জন করে'।

মোটকথা, বিশেষ কল্যাণের খাতিরে মুস্তাহাব কোনো কাজ তো বাদ দেওয়া যাবে; কিন্তু এর জন্য আল্লাহ তায়ালার বেঁধে দেওয়া কোনো সীমানা লঙ্ঘন করা বা শরিয়তের বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করা কোনোভাবেই জায়েজ নেই।

এ সূত্রে কিছু ঘটনা উল্লেখ করা যাক, যেগুলো থেকে প্রমাণিত হয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম শরিয়তের বিধানের বিপরীতে নামসর্বস্ব কল্যাণের বিবেচনা কখনোই গ্রহণযোগ্য মনে করেননি।

১. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত জয়নব রা.-কে বিয়ে করার ইচ্ছা করলেন। শরিয়তের দৃষ্টিতে এটা তার জন্য নিঃসন্দেহে জায়েজ ছিল। কিন্তু তৎকালের সমাজ একে অবৈধ মনে করত এবং খারাপ চোখে দেখত। তাই তাঁর মনে আশঙ্কা জাগল, সাধারণ লোকজন এ বিয়েকে কেন্দ্র করে ফেতনায় পড়ে যাবে এবং কানাঘুষা করে আপত্তিকর নানা কথা বলে নিজেদের ইমান-আমল বরবাদ করে ফেলবে। পাশাপাশি ইসলামের ব্যাপারেও তাদের মনে তৈরি হতে পারে খারাপ ধারণা। ফলে তারা দীন থেকেই দূরে সরে যাবে। এসব ভেবে তিনি বিয়ে থেকে দূরে রইলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা চাইলেন মানুষের বিভ্রান্তি ও কুসংস্কার দূর হোক। তাই ক্ষুদ্র কল্যাণের বিবেচনা না করে ইসলামের বিধান প্রাধান্য দিলেন এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

অবহিত করে অহি নাজিল করলেন : এবং আপনি মানুষকে ভয় করছেন; অথচ আল্লাহ তায়ালাই আপনার ভয়ের অধিক দাবিদার। এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাইনাব রা.-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দিলেন। কারণ, তখন যদি 'লোকে কী বলবে' ভয়ে শরিয়তের বৈধ এই কাজটি পরিত্যাগ করা হত, তাহলে 'পালক পুত্রের স্ত্রী আপন পুত্রবধুর মতো নয়; পালক বাবার জন্য তাকে বিয়ে করা সম্পূর্ণ জায়েজ'—গুরুত্বপূর্ণ এই বিধানটির বাস্তব রূপ দেখা যেত না এবং মানুষের মন থেকে কুসংস্কারটিও দূর হত না। যার কারণে দীনের মধ্যে অস্পষ্টতা, অসম্পূর্ণতা ও বিকৃতি তৈরি হত।

২. কেবলা পরিবর্তনের ঘটনায় ইহুদিদের পক্ষ থেকে প্রবল বিরোধিতা ও ফেতনার আশঙ্কা ছিল। তাছাড়া এটি যেহেতু ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কোনো 'বিধান রহিতকরণ'-এর বিষয় ছিল, ভুল বুঝে অনেকে মুরতাদ হয়ে যাওয়ার ভয়ও ছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে সতর্ক করে আয়াত নাজিল করলেন—হে নবি, আপনার কাছে সত্য জ্ঞান আসার পরও যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন, তাহলে নিশ্চিতরূপেই আপনি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত। ফলে নবিজি সেই আশঙ্কা ও কল্যাণের কথা আমলে না নিয়ে আল্লাহর নির্দেশের ওপর অটল রইলেন।

৩. নবিজির ওফাতের পরপর চারদিকে বেশ কিছু ফেতনা ছড়িয়ে পড়ল। নামে-মুসলমান যারা ছিল,

ইসলাম ছেড়ে দলে দলে মুরতাদ হতে লাগল। আবু বকর রা. সবেমাত্র খলিফা হয়েছেন, শাসনকার্যে পুরোপুরি স্থির হয়ে বসার আগেই তাকে নামতে হল এসব ফেতনার মোকাবেলায়। এসবের মধ্যে সেসব লোকদের ফেতনাও ছিল, যারা বলছিল, প্রকাশ্য সম্পদের জাকাত উসুল করার হক শুধুমাত্র নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই ছিল। তার পরবর্তী কোনো খলিফার সে অধিকার নেই। কিন্তু খলিফা আবু বকর রা. ইসলামের বিধানের প্রশ্নে ছিলেন অটল ও আপসহীন। অত্যন্ত নিষ্কম্প কণ্ঠে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিলেন। সে সময়ে একই সাথে কয়েক দিকে বেজে উঠল জিহাদের রণঢঙ্কা। উমর রা. বিশেষ এই সংকটের মুহূর্তে কল্যাণ বিবেচনা করে এখনই জিহাদ শুরু না করার পরামর্শ দিলেও তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি। ইমানি চেতনা থেকে দৃঢ়চিত্তে বললেন, আমি বেঁচে থাকতে দীনের সামান্য কোনো বিকৃতিও হতে দেব না। শেষ পর্যন্ত হজরত উমর রা.-সহ অন্যান্য সাহাবাগণ স্বীকার করলেন, খলিফা আবু বকরের সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল এবং তাদের মনে যে খটকা ছিল তা দূরীভূত হয়েছে।

৪. হজরত উমর রা.-এর শাসনকালে ইসলাম গ্রহণ করেছিল গাসসানের বাদশা জাবালা ইবনে আইহাম। একবার তাওয়াফ করতে এসে মামুলি কোনো কথার জের ধরে সে এক বেদুইনকে থাপ্পড় মেরে বসে। এতে লোকটির দাঁত পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নালিশ

গেল উমরের দরবারে। তিনি কিসাসস্বরূপ বাদশার দাঁতও ফেলে দেওয়ার ফরমান জারি করলেন। বোঝাই যাচ্ছিল নওমুসলিম বাদশা নিজের এ অপমান মেনে নিতে পারবে না। ফলে, ইসলামের স্বার্থেই তার সাজাটি তখন মওকুফ করার প্রয়োজন ছিল। উমরের মতো মানুষ চাইলে সে বেদুইন লোকটিকে বুঝিয়ে-সমঝিয়ে মোকদ্দমাটি শেষ করে দিতে পারতেন। কারণ, একটা দেশের রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমান হওয়াতে তৎকালে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু শরিয়তের বিধানের প্রশ্নে খলিফা উমর ছিলেন অনড়। সাজা মওকুফ করার কথা তার মনে জাগেনি। ইসলামের ফয়সালাটি সোজা শুনিয়ে দিলেন—আহত লোকটি থেকে ক্ষমা নিয়ে নাও, না হয় কেসাস আমি নেবই। বাদশা বিপাকে পড়ে চিন্তাভাবনার জন্য কিছু সময় চেয়ে নিল এবং রাতে রাতেই মুরতাদ হয়ে পালিয়ে গেল।

ঘটনাগুলো থেকে আমরা এ শিক্ষাটিই পাই—বিশেষ কোনো কল্যাণের কথা ভেবে কোনো অবস্থাতেই গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া যাবে না। রদবদল করা যাবে না শরিয়তের সামান্য কোনো বিধানের মধ্যেও।

অবশ্য, শরিয়তে একটি মূলনীতি রয়েছে—বড় কোনো বিপদ থেকে বাঁচার লক্ষ্যে ছোট কোনো বিপদ মেনে নেওয়া হয়। যেমন, কোনো ব্যক্তি নামাজে দাঁড়ানোর পর দেখতে পেল অন্ধ এক লোক পথ ভুল করে কুয়ায় পড়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক সময়ে নামাজ

ভাঙা গুনাহের কাজ হলেও এই পরিস্থিতিতে তা করা আবশ্যক ও ফরজ। নামাজ ছেড়ে দিয়ে অন্ধ লোকটিকে বাঁচাতে হবে। এখানে নামাজ ভঙ্গ করার মতো ছোট বিষয়টিকে মেনে নেওয়া হয়েছে বড় বিপদটি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই। ফিকহের ভাষায় একে বলা হয়—'আহওয়ানুল বালিইয়্যাতাইন' বা দুই বিপদের ছোটটিকে গ্রহণ করা।

ভেবে দেখার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল—আপতিত দুই সমস্যার মধ্যে সহজতর কোনটি? এটি নির্ণয় করা সহজ নয়। শরিয়তের পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়া সাধারণ মানুষ পদে পদে ভুল করবে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে বেশির ভাগ মানুষ নিজে নিজে বিচার করার সময় শরিয়তের নির্দেশনা গুরুত্ব না দিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ প্রাধান্য দেয় এবং ধনসম্পদ ও খ্যাতির লোভে পড়ে শরিয়তের দৃষ্টিতে বড় বিপদকে ছোট ও সহজ মনে করে বসে। এজন্য এ সিদ্ধান্তটি কেবল সে-ই দিতে পারে, এবং তার থেকেই নিতে হবে, যিনি শরিয়তের সকল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হওয়ার পাশাপাশি দীনদারি ও পরহেজগারিতে অত্যন্ত মজবুত। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে আল্লাহওয়ালা আলেমদের সিদ্ধান্ত আবশ্যক।

দুটি বিপদ থেকে অপেক্ষাকৃত সহজ বিপদটি চিহ্নিত করব কীভাবে—এর জন্যও অনেকগুলো নিয়ম ও পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়েছে। নিয়মগুলো পরিপূর্ণরূপে আত্মস্থ করা, এসবের মর্ম সঠিক

অনুধাবন করা, এরপর উদ্ভূত বিষয়টি আদৌ কোনো নিয়মের আওতায় পড়ে কি না, বা পড়ে থাকলে সেটি ঠিক কোনটি—এসবের সমাধান করতে শরিয়তের প্রয়োজনীয় সকল শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি, গভীর ভাবনা-বিশ্লেষণ, একনিষ্ঠ ধার্মিকতা ও দীন পালনে আপসহীন অবিচলতার প্রয়োজন।

কোনো নাজায়েজ কাজের ব্যাপারে গভীর ভাবনা ও দালিলিক বিশ্লেষণের পর যদি প্রমাণিত হয় আপাতত একে মেনে না নিয়ে উপায় নেই; অন্যথায় এর চেয়ে বড় নাজায়েজ কাজে লিপ্ত হতে হবে, তাহলে এর অনুমোদন দেওয়ার সময় খুব স্পষ্টভাবে বলে দিতে হবে—কাজটি মৌলিকভাবে নাজায়েজ; তবে শরিয়তের বিশ্লেষণের আলোকে বিশেষ প্রয়োজনবশত আপাত ছাড় দেওয়া হয়েছে। এমনকি প্রথমবার বলে দিয়ে এরপর চুপ করে থাকলে হবে না। বারবার বলতে হবে এবং সর্বদা এর বিশেষ ফিকহি অবস্থাটি আলোচনার ভেতরে রাখতে হবে। আর না হয় জনসাধারণ দ্রুতই এর মূল অবস্থানটি ভুলে গিয়ে স্বাভাবিক বৈধ একটি কাজ বলে ভাবতে শুরু করবে। ফলে, যেখানে ছাড় পাওয়ার মতো বিশেষ অবস্থাটি থাকবে না, সেখানেও অবলীলায় এতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

এর পরিষ্কার একটি উদাহরণ হল—ছবি তোলার বিষয়টি। সকলের ঐকমত্যে এটি হারাম একটি কাজ। কিন্তু হজ ও ন্যাশনাল আইডি কার্ডের জন্য

সরকারিভাবে ছবি তোলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে, উলামায়ে কেরামও জরুরি প্রয়োজনে দরকার অনুপাতে একে জায়েজ ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা হয়েছে এই যে, ঠিক কী পরিস্থিতির কারণে জায়েজ বলা হয়েছে এবং কোন কোন পরিস্থিতিতেই কেবল জায়েজ হবে এ কথাগুলো যেমন শক্তভাবে লিখিত ও মৌখিকরূপে আলোচনা করা দরকার ছিল সেভাবে হয়নি। উলটো কিছু আলেম নিজেরাও নিজেদের জীবনে ও কর্মে গাফলতি দেখিয়েছেন। ছবি ওঠাতে গেলে তারা বাধা দেন না; পত্রপত্রিকায় তাদের ছবি আসে, কিন্তু আপত্তি জানিয়ে টু শব্দটিও করেন না। শুধু যে চুপ বসে আছেন তাই না; বরং, অনেক আলেম নিজেই তাতে লিপ্ত হয়েছেন। একই কথা টেলিভিশনের ব্যাপারেও। এ থেকে লোকজনের ধারণা হয়েছে—এ বুঝি কোনো গুনাহের কাজই না। তাদের হৃদয় থেকে টেলিভিশনের কদর্যতার বিষয়টি উবে গেছে এবং সাধারণ একটি জায়েজ কাজ হিসেবে একে মূল্যায়ন করছে। এমন আচরণ ও কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃত মুসলমান তো সে-ই, যে কদমে কদমে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ রাখে এবং তার বেঁধে দেওয়া সীমানাগুলো সযত্নে রক্ষা করে চলে।

যারা দেশ ও জনগণের পার্থিব-অপার্থিব কল্যাণের জন্য নয়, নিছক ক্ষমতা ও নেতৃত্বের জন্য রাজনীতি করে, তারা রাজনীতিতে ধর্মীয় বিধানাবলি লঙ্ঘন

করবেই। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অবাক তো হতে হয় সেসব লোকদের দেখে, যারা মুখে দাবি করে—আমরা সমকালে প্রচলিত এই রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছি দেশে সত্যিকারের ইসলামি শাসন কায়েমের জন্য, কিন্তু কার্যত হালাল-হারামের কোনো পরোয়া করে না, এবং শরিয়ত অসমর্থিত নানা কর্ম ও কৌশল প্রয়োগে বিকৃত ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়।

আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন, ইসলামি শাসন কায়েম করতে গিয়ে নিজেরাই তো অনৈসলামিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, এটা কেমন হল? তারা জবাব দেবে এই পদ্ধতিটি যদিও নাজায়েজ; কিন্তু বর্তমানে এ ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সুতরাং, জায়েজ-নাজায়েজ না দেখে প্রথমে ক্ষমতা লাভ করার জন্য চেষ্টা করা জরুরি। ক্ষমতা পেয়ে গেলে সারা দেশে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করা সময়ের ব্যাপারমাত্র।

মূলত তারা একটি ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। আমরা তাদের উদ্দেশ্য ও নিয়তের শুদ্ধতা নিয়ে সন্দেহ করি না; কিন্তু তাদের কর্মপদ্ধতিটি এমন যে, এ দিয়ে কোনোভাবেই ইসলাম কায়েম করা সম্ভব নয়। কারণ, বাস্তবতা হল, ইসলাম অসমর্থিত পদ্ধতি দিয়ে অমুসলিম কাফেররা সফল হতে পারে; কিন্তু দীনদার মুসলিমগণ? প্রথমত, এর দ্বারা সফলতা তো পাবেই না; দ্বিতীয়ত, বাহ্যিকভাবে সফল হলেও এ দিয়ে ইসলামের কোনো উপকার হবে না; ইসলামের নাম

দিয়ে প্রতিষ্ঠা হবে অন্য কিছু। আর, বাহ্যিক সফলতাটিও হবে নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। কিছুদিন পরই ব্যর্থ ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। কারণ, মূল ভীতটাই যখন নড়বড়ে, এর ওপর প্রাসাদটি দাঁড়াবে কী করে?

বিবেক, বুদ্ধি ও শরিয়তের সরাসরি বক্তব্য এবং অভিজ্ঞতা বলে—আল্লাহ তায়ালার নাফরমানি করে মুসলিম জাতি কখনোই সফল হতে পারবে না। এ পথে কাফেররা যে সফলতা পায়, এ দিয়ে মুসলমানদের পরিমাপ করা ভুল চিন্তা। কারণ, কাফের ও মুসলমানদের সত্তাগত রুচি ও প্রবণতার মাঝে আসমান-জমিন ব্যবধান। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে—একটি ওষুধ একজনের জন্য কার্যকর কিন্তু স্বভাব ও রুচির ব্যবধানের কারণে অপরজনের জন্য ক্ষতিকর। প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা আছে—একজন মেথর লোক আতরের দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তার মস্তিষ্ক যেহেতু পূর্ব থেকে মনুষ্য মলের দুর্গন্ধে প্রীত ও অভ্যস্ত হয়ে আছে, তাই আতরের সুগন্ধ বরদাশত করতে পারেনি। বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এটা-ওটা নানা রকমের চিকিৎসা করেও কিছুতে কিছু হল না। একসময় তার ভাইয়ের কাছে সংবাদ পৌঁছলে সে তৎক্ষণাৎ একটি শিশিতে ভরে এক শিশি মল এনে তার নাকে ধরল এবং বেহুঁশ লোকটি সাথে সাথে চোখ মেলে তাকাল।

ঠিক এভাবে কাফের ও ফাসেকদের মস্তিষ্ক গুনাহের কদর্যতায় লেপ্টে আছে, এজন্য হারাম ও

নাজায়েজ কাজের দুর্গন্ধ তাদের জন্য খুব উপকারী। কিন্তু মুসলমান সে তুলনায় শাহজাদার মতো। তার মস্তিষ্ক খুব পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র। তার জন্য ইসলামের বিধানাবলির সুগন্ধই শুধু উপকারী হয়। কোনো শাহজাদা যদি এমন পরিস্থিতিতে পড়ে আর বোকা কোনো লোক তাকে মেথরের ওপর বিবেচনা করে মলের দুর্গন্ধ শুঁকিয়ে দেয়, তাহলে তার মস্তিষ্ক আরও গড়বড় হয়ে যাবে। সুতরাং, মুসলমানকে কাফের ও ফাসেকদের সাথে তুলনা করা এবং এটা মনে করা যে, তাদের জন্য যা উপকারী, মুসলমানদের বেলায়ও তা কার্যকর—সম্পূর্ণ ভুল চিন্তা।

প্রসঙ্গত আরেকটি ঘটনা মনে পড়ল।

এক লোক গাছে ওঠার পর নামতে সাহস পাচ্ছিল না। নিরুপায় হয়ে সে লোকজনকে ডাকল। গাছের তলায় সকলে একত্রিত হয়ে বুদ্ধি করতে লাগল কীভাবে নামানো যায়। একেকজন একেক কথা বলে। কিন্তু কোনো কৌশলই জুতসই মনে হচ্ছিল না। শেষে সিদ্ধান্ত হল এই মামলা নিয়ে পাড়ার সেই বুড়ো বুদ্ধিমান লোকটির কাছে যেতে হবে। কারণ, মহল্লায় সে-ই সবচেয়ে বিচক্ষণ। ঘটনা শুনে বুড়ো লোকটি গাছের তলায় এসে প্রথমে খেদোক্তি করে হতাশার সুরে বলল—তোমরা তো দেখি সকলেই বোকা। আমাকে ছাড়া মামুলি একটা সমস্যাও সমাধান করতে পারো না। এরকম হলে চলবে কী করে! এটার সমাধান তো একদমই সহজ। লম্বা একটা রশি নিয়ে

এসো। রশি আনার পর বলল, একটা মাথা ওর কাছে পাঠাও। সে যখন রশিটা শক্ত করে ধরবে, তখন নিচে থেকে খুব জোরে হ্যাঁচকা টান দেবে। নামবে না মানে!

শেষে তা-ই করা হল—এবং লোকটি গাছের ওপর থেকে এত জোরে মাটিতে এসে পড়ল যে, হাড়গোড় ভেঙে সেখানেই শেষ। এবার সবাই মিলে ধরল বুড়োকে—এটা কী হল? বুড়ো লোকটি জবাব দিল—আমার কী দোষ! এর ভাগ্যটাই খারাপ। না হয় এ জীবনে আমি কতজনকে দেখলাম কুয়া থেকে তোলা হয়েছে, ঠিক এভাবেই।

তো, গাছে চড়া লোকটিকে কুয়ায় পতিত লোকের ওপর বিবেচনা করে এই বুড়ো বুদ্ধিমান যেমন ভালো কাজ করেনি, তেমনই মুসলমানকে কাফেরের ওপর বিবেচনা করা ভুল ও ধ্বংসাত্মক কাজ। কাফের নিচে পড়ে আছে, কিন্তু মুসলমান অবস্থান করছে উচ্চ স্থানে। কাফেররা যে পদ্ধতি অবলম্বন করে নিচে থেকে ওপরে উঠে আসতে সফল হচ্ছে, সেই একই পদ্ধতি মুসলমান গ্রহণ করলে ওপর থেকে নিচে পতিত হবে। জুতার মধ্যে নাপাকি লাগলে ছুড়ে ফেলা হয় না, কিন্তু টুপির মধ্যে একটু দাগ লাগলেও সাথে সাথে খুলে ফেলা হয়। আল্লাহ তায়ালার কাছে মুসলমান টুপির মতোই সম্মানিত এবং কাফের জুতার মতো নীচ ও অপদস্থ।

সুতরাং, গুনাহের কাজ ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে মুসলমান কখনো সফল হবে না। উহুদ যুদ্ধের

ঘটনাই দেখুন—মুসলমানরা কাফেরদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটি ইজতেহাদি ভুলের কারণে জয়টি পরাজয়ে রূপান্তরিত হল। আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাজিল করলেন :

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

আর আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেন, যখন তোমরা তাদের হত্যা করছিলে তাঁর নির্দেশে। অবশেষে যখন তোমরা দুর্বল হয়ে গেলে এবং নির্দেশ সম্পর্কে বিবাদ করলে আর তোমরা অবাধ্য হলে তোমরা যা ভালোবাসতে তা তোমাদের দেখানোর পর। তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়া চায় আর কেউ চায় আখেরাত। তারপর আল্লাহ তাদের থেকে তোমাদের ফিরিয়ে দিলেন, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন। আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ মুমিনদের ওপর অনুগ্রহশীল।[38]

আয়াতে ভুলটিকে বাহ্যিক দিক বিবেচনা করে পাপ শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে, অন্যথায় বাস্তবে এটি শরিয়তের দৃষ্টিতে সহনীয় রকমের চিন্তা ও ধারণাগত

ভুল (ইজতেহাদি ভুল) ছিল। মূল ঘটনাটি ছিল এমন : উহুদ যুদ্ধে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় পঞ্চাশজন সাহাবিকে গুরুত্বপূর্ণ এক ঘাঁটিতে পাহারায় বসালেন এবং অত্যন্ত জোর দিয়ে বললেন : আমরা হারি বা জিতি, তোমরা এখান থেকে নড়বে না। কিন্তু একপর্যায়ে তারা যখন দেখলেন যুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং মুসলমানরা পুরোপুরি জিতে গেছে, তখন গনিমতের মাল জমা করার জন্য ঘাঁটি ছেড়ে প্রায় সকলেই ময়দানে চলে এলেন। কাফেররা সুযোগ বুঝে ঠিক এই জায়গাটি দিয়েই পুনরায় হামলা করে বসল এবং মুসলমানদের নিশ্চিত বিজয়টি পরাজয়ে পর্যবসিত হল।

অথচ এখানে দুনিয়া উপার্জন করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং, তারা ভাবলেন নিজেদের দায়িত্বটি শেষ হয়েছে, এবার বসে না থেকে পরবর্তী কাজে অংশ নিই। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য নয়; বরং মুসলমানদের সম্মিলিত উপকারের জন্যই এ উদ্যোগটি তারা নিয়েছিলেন। এদিক বিবেচনায় এটি দীনি একটি কাজই ছিল। যদি নিজেদের স্বার্থের জন্যই হত, তাহলে ঘাঁটি ছেড়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। গনিমতের মাল পূর্বনির্ধারিত বিধান অনুসারে বণ্টিত হয়ে যুদ্ধে অংশ নেওয়া প্রতিটি সদস্যের কাছে তার পরিমাণটি চলে আসবে, সরাসরি ময়দানে যুদ্ধ করুক বা অন্য কোনো দায়িত্ব পালন করুক। সুনিশ্চিতভাবে প্রত্যেকেই তার অংশটি পাবে এবং

নিজ উদ্যোগে মাল জমা করলেও নির্ধারিত অংশের চেয়ে বেশি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই—এ বিষয়গুলো তাদের জানা ছিল ভালোভাবেই।

সুতরাং বোঝা গেল, তারা পার্থিব সম্পদ জমা করতে গিয়েছিলেন ঠিক, কিন্তু সম্পদকে নিছক সম্পদ হিসেবে নয়; বরং ইবাদত মনে করে আখেরাত পাওয়ার জন্যই কাজটি তারা করেছিলেন। আমরা যখন গভীর থেকে বিশ্লেষণ করে বিষয়টি এভাবে বুঝতে পারলাম, তখন উল্লেখিত আয়াতের মূল মর্মটি বোঝাও আমাদের জন্য সহজ হয়ে গেল। আয়াতে যে বলা হয়েছে—'তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যারা দুনিয়া কামনা করে', এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা বোঝাতে চেয়েছেন —'তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যারা দুনিয়া কামনা করে, অবশ্য যদিও তা আখেরাত লাভের জন্যই ছিল...।' এবং পরে যে বলা হয়েছে —'আর কেউ কেউ আখেরাত চায়', এর দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন—'কেবলই আখেরাত চায়'।[১৩]

বিষয়টি এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়—ঘাঁটি পাহারা দেওয়া এবং গনিমতের সম্পদ জমা করা উভয়টিই আখেরাতের কাজ ছিল। কিন্তু এ দুয়ের মাঝে ঘাঁটি পাহারা দেওয়ার কাজটি ছিল সে সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর শরিয়তের দৃষ্টিতে দীনি কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বাদ দিয়ে অগুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া নাজায়েজ।

তাদের ধারণাগত ভুলের কারণে তারা এই নাজায়েজ কাজটি করেছিলেন। আয়াতে এই 'নাজায়েজ কাজ' বোঝাতেই 'দুনিয়া' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, দুনিয়া শব্দের অনেকগুলো অর্থের এটিও একটি।

এর সুন্দর উদাহরণ হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের ঘটনাটি। তিনি জিহাদের নিয়তে উন্নত জাতের কিছু ঘোড়া পুষেছিলেন। একদিনের ঘটনা। ঘোড়াগুলো দেখাশোনার কাজে মশগুল হয়ে কী একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে ভুলে গেলেন। এ কারণে তার খুব খারাপ লাগল এবং নিজের প্রতি আক্ষেপ করে বললেন—আমি আমার প্রভু থেকে বিমুখ হয়ে সম্পদের লোভে পড়ে গিয়েছি।

এই ঘটনার বিশ্লেষণটিও এমনই। অর্থাৎ ঘোড়াগুলো দেখাশোনা করার কাজটিও আখেরাতের কাজই ছিল; কিন্তু অন্য যে কাজটি থেকে গিয়েছিল তা ছিল এর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু। ফলে, সম্পদের ভালোবাসা এখানে মৌলিকভাবে প্রশংসনীয় ও কাঙ্ক্ষিত হলেও অন্য আরেকটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিঘ্ন তৈরি করার কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত ও নিন্দনীয় হয়েছে গেছে। হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামও এটিই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন।

উল্লেখ্য, পরিত্যক্ত কাজটি যদি ফরজ-ওয়াজিব কিছু হয়েও থাকে, তবু তা যেহেতু নিছক ভুলে

যাওয়ার কারণে হয়েছিল, তাই নবি হিসেবে তার নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারটি প্রশ্নবিদ্ধ হয় না।

যা-ই হোক, সাহাবায়ে কেরাম যদিও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাদের নিয়তের মধ্যে দুনিয়া অর্জনের কোনো লোভ ছিল না, তবু তাদের এই গবেষণা ও ধারণাগত ভুলটিই বিজয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনিভাবে হুনাইনের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর অন্তরে নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে সামান্য একটু গর্ববোধ চলে এসেছিল, শুধু এটুকুর কারণেই প্রথমে তাদের পরাজয়বরণ করতে হয়েছে।

তো এই যদি হয় অবস্থা—সাহাবায়ে কেরামের মতো মহান মানুষদের ইজতেহাদি ভুলের কারণেই বিজয় হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে বর্তমান পৃথিবীর মুসলমানদের অবস্থানটি কোথায়? তাদের ভুলগুলো সফলতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না কোন যুক্তিতে?

সাহাবায়ে কেরাম ও বর্তমান সময়ের মুসলমানদের বড় আরেকটি ব্যবধান হল—এখনকার মুসলমান স্বয়ং গুনাহকেই সফলতার সিঁড়ি হিসেবে মেনে নিয়েছে, এজন্য তাদের কর্মপদ্ধতিটি গোড়া থেকে গলদ; কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতিটি শত ভাগ শরিয়তসম্মত ছিল, ভুল যা হয়েছে তা ঘটনাক্রমে, অনিচ্ছায়। এ দুয়ের ব্যবধান আকাশপাতাল।

জিহাদ, রাষ্ট্র পরিচালনা ও অন্যান্য রাজনৈতিক কার্যাবলিতে সফলতা লাভ করার মূল শর্তই হল সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ-নির্দেশিত পন্থায় করতে হবে, তাঁর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর কিছু সুস্পষ্ট বক্তব্য গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন।

কুরআনের আয়াত

- আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো। (২:৪০)
- হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (২:১৫৩)
- পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবিদের প্রতি ইমান আনলে এবং আল্লাহ-প্রেমে আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীকে ও দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও জাকাত প্রদান করলে আর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থসংকট দুঃখ-ক্লেশ ও

সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ আর এরাই মুত্তাকি। (২:১৭৭)

- পেছন দিক দিয়ে তোমাদের ঘরে প্রবেশ করাতে কোনো পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে। সুতরাং তোমরা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো; তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (২:১৮৯)
- যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; কিন্তু সীমালঙ্ঘন কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না। (২:১৯০)
- তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো এবং জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (২:২৪৪)
- এরপর তালুত যখন সৈন্যবাহিনীসহ বের হল, সে তখন বলল, আল্লাহ এক নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে তা থেকে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়; আর যে তার স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভুক্ত; এ ছাড়া যে তার হাতে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সে-ও। অতঃপর অল্পসংখ্যক ব্যতীত তারা তা থেকে পান করল। সে ও তার সঙ্গী ইমানদাররা যখন তা অতিক্রম করল তখন তারা বলল, জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করার মতো শক্তি আজ আমাদের নেই। কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে তারা বলল, আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে! আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। তারা যখন জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হল তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ধৈর্য দান করো, আমাদের পা অবিচলিত রাখো এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য দান করো। (2:২৪৯-250)

- তোমরা যদি ধৈর্যশীল ও মুত্তাকি হও তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন। (৩:১২০)
- হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং সাবধান হয়ে চলো, তবে তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের ওপর আক্রমণ করলে আল্লাহ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। (৩:১২৫)
- তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিতও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও। (৩:১৩৯)
- তোমরা কি মনে করো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে

জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্যশীল তা এখনো প্রকাশ করেননি? (৩:১৪২)

- এ কথা ব্যতীত তাদের আর কোনো কথা ছিল না—'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ এবং আমাদের কাজে সীমালঙ্ঘন তুমি ক্ষমা করো, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখো এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।' অতঃপর আল্লাহ তাদের পার্থিব পুরস্কার ও উত্তম পারলৌকিক পুরস্কার দান করেন। আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন। (৩:১৪৭-১৪৮)
- আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালোবাসো তা তোমাদের দেখানোর পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কেউ ইহকাল চাচ্ছিল আর কেউ পরকাল চাচ্ছিল। অতঃপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে তাদের হতে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদের ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। (৩:১৫২)
- আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করলে তোমাদের ওপর জয়ী হওয়ার কেউ থাকবে না। আর তিনি তোমাদের সাহায্য না করলে তিনি ছাড়া কে এমন আছে, যে তোমাদের সাহায্য করবে?

মুমিনগণ আল্লাহর ওপরই ভরসা করুক। (৩:১৬০)

- জখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ ও রাসুলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে। (৩:১৭২)
- এরাই শয়তান, তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা মুমিন হও তবে তাদের ভয় কোরো না, আমাকেই ভয় করো। (৩:১৭৫)
- হে ইমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ করো, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো এবং সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো, আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (৩:২০০)
- আর আল্লাহ তো বনি ইসরাইলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের থেকে বারোজন দলপতি নিযুক্ত করেছিলাম; আর আল্লাহ বলেছিলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা যদি সালাত কায়েম করো, জাকাত দাও, আমার রাসুলদের ওপর ইমান আনো ও তাদের সম্মান করো এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করো, তবে তোমাদের পাপ অবশ্যই মোচন করব এবং নিশ্চয়ই তোমাদের প্রবেশ করাব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। এরপরও কেউ কুফরি করলে সে তো সরল পথ হারাবে। (৫:১২)

- কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং মুমিনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহর দলই তো বিজয়ী হবে। (৫:৫৬)
- তারা যদি তাওরাত, ইঞ্জিল ও তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করত, তাহলে তারা তাদের ওপর ও পদতল হতে আহার্য লাভ করত। (৫:৬৬)
- যদি সেসব জনপদের অধিবাসী ইমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করতাম, কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের শাস্তি দিয়েছি। (৭:৯৬)
- মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, 'আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো এবং ধৈর্যধারণ করো; জমিন তো আল্লাহরই। তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী করেন আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকিদের জন্য। (৭:১২৮)
- যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হত তাদেরকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি; এবং বনি ইসরাইল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভবাণী সত্যে পরিণত হল, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল, আর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং

যেসব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তা ধ্বংস করেছি। (৭:১৩৭)

- হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কোনো দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্যধারণ করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (৮:৪৫-৪৬)
- যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায় তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। (৮:৬২)
- হে নবি! মুমিনদের যুদ্ধের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করো; তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুশোজনের ওপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশজন থাকলে এক হাজার কাফেরের ওপর বিজয়ী হবে। কারণ, তারা এমন এক সম্প্রদায়, যাদের বোধশক্তি নেই। আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের দুর্বলতা আছে, সুতরাং তোমাদের একশজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুশোজনের ওপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের

এক হাজার থাকলে আল্লাহর অনুজ্ঞাক্রমে তারা দুই হাজারের ওপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (৮:৬৫-৬৬)

- তারা তোমার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চাইলে, তারা তো পূর্বে আল্লাহর সাথেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে; অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তাদের ওপর শক্তিশালী করেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৮:৭১)
- যতক্ষণ তারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে তোমরাও তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের পছন্দ করেন। (৯:৭)
- আল্লাহ তোমাদের তো সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের যুদ্ধের দিন, যখন তোমাদের উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য; কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। (৯:২৫)
- তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করবে, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে। এবং জেনে রাখো, আল্লাহ তো মুত্তাকিদের সঙ্গে আছেন। (৯:৩৬)

- তারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী, সৎকাজের নির্দেশদাতা, অসৎকাজে নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী; এই মুমিনদের তুমি শুভসংবাদ দাও। (৯:১১২)
- হে মুমিনগণ! কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ করো এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকিদের সঙ্গে আছেন। (৯:১২৩)
- জেনে রাখো! আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা ইমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ দুনিয়া ও আখেরাতে, আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই; এটিই মহাসাফল্য। (১০:৬২-৬৪)
- সুতরাং ধৈর্যধারণ করো, শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্যই। (১১:৪৯)
- হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তার দিকেই ফিরে আসো। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি বর্ষাবেন। তিনি তোমাদের আরও শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি

বৃদ্ধি করবেন এবং তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। (১১:৫২)

- নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি মুত্তাকি ও ধৈর্যশীল, আল্লাহ সেরূপ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। (১২:৯০)
- যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্যধারণ করে, তোমার প্রতিপালক এসবের পর তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৬:১১০)
- আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে। (২১:১০৫)
- অবশ্যই আল্লাহ রক্ষা করেন মুমিনদের; তিনি কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। (২২:৩৮)
- তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ'। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অন্য দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিষ্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থল, গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় ও মসজিদ—যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে।

আল্লাহ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (২২:৪০)

- মুমিনদের উক্তি তো এই—যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও আনুগত্য করলাম।' আর তারাই তো সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে, তারাই সফলকাম। (২৪:৫১-৫২)
- তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীন—যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদের অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোনো শরিক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী। (২২:৫৫)
- হে বৎস! সালাত কায়েম করো, সৎকর্মের নির্দেশ দাও, আর অসৎকর্মে নিষেধ করো এবং

বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো। এটিই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ। (৩১:১৭)

- আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী। (৩৭:১৭১-১৭৩)
- বলো, হে আমার মুমিন বান্দাগণ! তোমরা স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করো। যারা এই দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহর জমিন প্রশস্ত, ধৈর্যশীলদের তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে। (৩৯: ১০)
- নিশ্চয়ই আমি আমার রাসুলগণ ও মুমিনদের সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে। (৪০:৫১)
- আমি রক্ষা করলাম তাদের, যারা ইমান এনেছিল এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করত। (৪১:১৮)
- যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (৪৬:১৩)
- হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন। (৪৭:৭)
- তা এজন্য যে, আল্লাহ তো মুমিনদের অভিভাবক এবং কাফেরদের তো কোনো অভিভাবকই নেই।

(৪৭:১১)

- আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছেন, আমি অবশ্যই বিজয়ী হব এবং আমার রাসুলগণও। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায়, যারা ভালোবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচারীদের—হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ সুদৃঢ় করেছেন ইমান এবং তাদের শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রুহ দ্বারা। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখো, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে। (৫৮:২১-২২)
- যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ করে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন রিজিক। যে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই; আল্লাহ সমস্ত কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। ... আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ তার সমস্যা সমাধান সহজ করে দেবেন। (৬৫:২-৪)

- বলেছি, 'তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা করো, তিনি তো মহাক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন, তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদীনালা। (৭১:১০-১২)
- তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; অতএব তাকেই গ্রহণ করো কর্মবিধায়করূপে। (৭৩:৯)
- এভাবে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি জালেমদের একদলকে অন্য দলের বন্ধু করে থাকি। (৬:১২৯)

হাদিস ও আসার

- ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এই আয়াতের (৬:১২৯) ব্যাখ্যা হল—কোনো জাতির (পাপাচারের কারণে) আল্লাহ যখন তাদের শাস্তি দিতে চান, তাদের ওপর নিকৃষ্ট শাসকদের চাপিয়ে দেন। আর সুখ-শান্তি ও কল্যাণ চাইলে সবচেয়ে ভালো লোকদের হাতে ন্যস্ত করেন তাদের শাসনের ভার। কোনো এক আসমানি কিতাবে লেখা আছে : আমি প্রথমে আমার এক শত্রু দিয়ে অন্য শত্রুকে বিনাশ করি, এরপর এই শত্রুকে ধ্বংস করি আমার অনুগত প্রিয় বান্দাদের মাধ্যমে।[40]

• মালিক ইবনে দিনার রহ. বলেন, আমি জবুর কিতাবে এই কথাটি পড়েছি—আমি মুনাফিকদের দিয়ে মুনাফিকদের থেকে প্রতিশোধ নিই, এরপর সকল মুনাফিককে ধ্বংস করি। এই কথাটি কুরআনুল কারিমেও আছে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : আর এভাবেই আমি জালেমদের কতককে কতকের বন্ধু বানিয়ে দিই, তারা যা অর্জন করত সে কারণে।

হাফেজ ইবনে আসাকির রহ. আবদুল বাকি ইবনে আহমদের জীবনীতে ইবনে মাসউদ রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো জালেমকে সাহায্য করে, আল্লাহ সে জালেমকে তার ওপর চড়াও করিয়ে দেন।

কোনো এক কবি এই মর্মটিকেই তার কাব্যছন্দে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

وما من يد إلا يد الله فوقها • ولا ظالم إلا سيبلي بظالم

সকল দাম্ভিক হাতের ওপর আছে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর হাত, আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন, আমি এক জালেমকে নিপাত করি অপর এক জালেমকে দিয়েই।

একটু ওপরে ছোট যে আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছে, তার মূল মর্ম হল—আমি কোনো জালেমের ঔদ্ধত্য দমন করে জুলুম সমূলে উৎপাটন করার জন্য তার বিরুদ্ধে অপর এক জালেমকে দাঁড় করিয়ে দিই।

• ইমাম আমাশ রহ. বলেন, আমি বড়দের থেকে এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি শুনেছি, তারা বলেছেন, আল্লাহ বলছেন—মানুষ যখন খারাপ হয়ে যায়, আমি নিকৃষ্ট লোকদের তাদের শাসক বানিয়ে দিই।[42]

মালেক ইবনে দিনার রহ.-এর উক্তিটি ইবনে আবি হাতিম ও আবুশ শায়খ রহ.-ও বর্ণনা করেছেন।[43] একই রেফারেন্সে ইমাম হাকিম তার ইতিহাসগ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকি *শুআবুল ইমান* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যেমন, তোমাদের শাসকও তেমনই হবে।[44] একই হাদিস আবু বাকরা রহ.-এর সূত্রে দাইলামিকৃত *মুসনাদে ফেরদাউসে* (৩:৩৫২) এবং আবু ইসহাক সাবিইর সূত্রে ইমাম বায়হাকিকৃত *শুআবুল ইমানে* (৬:২৩) বর্ণিত হয়েছে।

قال الامام السخاوي رحمه الله تعالى : حَدِيث : كَمَا تَكُونُونَ يُوَلَّى عَلَيْكُمْ أَوْ يُؤَمَّرُ عَلَيْكُمْ . الحاكم ومن طريقه الديلمي من حديث يحيى بن هاشم حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أظنه عن أبي بكرة مرفوعا بهذا. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في السابع والأربعين . بلفظ : يؤمر عليكم . بدون شك . وبحذف أبي بكرة. وقال : إنه منقطع. وراويه يحيى في عداد من يضع.

وله طريق أخرى. فأخرجه ابن جميع في معجمه. والقضاعي في مسنده. من جهة الكرماني بن عمرو حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة بلفظ : يولى عليكم . بدون شك. وفي سنده إلى مبارك مجاهيل

• একবার হজরত হাসান বসরি রহ. শুনতে পেলেন, এক লোক হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বদদোয়া করছে। তখন তিনি বললেন : না, এটা করবে না। তোমরা পাপাচারের মাধ্যমে হাজ্জাজকে নিয়ে এসেছ। আমার

আশঙ্কা হয়, হাজ্জাজ যদি পদত্যাগ করে বা মারা যায়, তাহলে বানর আর শুকরকে তোমাদের শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া হবে। বর্ণিত আছে : তোমাদের আমল অনুযায়ী শাসক নিয়োগ করা হয়। তোমরা যেমন হবে, শাসকও তেমন হবে। কোনো এক মনীষী বলেছেন : আমাদের গুনাহের কারণেই আমাদের ওপর বিপদাপদের পাহাড় নামে। আমরা যদি তওবা করি, তাহলে আল্লাহ এ মুসিবত উঠিয়ে নেবেন। হাদিসে বর্ণিত একটি দোয়াও আছে এমন—হে আল্লাহ, আমাদের গুনাহের কারণে এমন শাসক নিয়োগ করবেন না, যে আমাদের ওপর রহম করে না।[45]

• ইমাম বায়হাকি রহ. কাব আল-আহবার রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন—প্রতি যুগে মানুষের অন্তরের অবস্থা অনুপাতে আল্লাহ তায়ালা একজন শাসক নিযুক্ত করেন। যখন মানুষের কল্যাণ চান, একজন ন্যায়পরায়ণ ভালো শাসক নিয়োগ দেন; কিন্তু তাদের মন্দ কাজের কারণে শাস্তি দিতে চাইলে নিকৃষ্ট একজন শাসক তাদের ওপর চাপিয়ে দেন।[46]

• ইমাম বায়হাকি রহ. হজরত হাসান রহ. থেকে বর্ণনা করেন—বনি ইসরাইলের লোকজন একবার মুসা আ.-এর কাছে গিয়ে আবদার করল—আল্লাহ তায়ালা আমাদের ওপর কখন সন্তুষ্ট থাকেন আর কখন অসন্তুষ্ট থাকেন, এটা আমরা বুঝতে পারি মতো

কোনো আলামত আপনি তাঁর থেকে চেয়ে নিয়ে আসুন। মুসা আ. সে অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন : তাদের বলে দিন—আমি যখন তাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকি, তখন সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ উত্তম মানুষটিকে তাদের শাসনকর্তা বানাই; কিন্তু যখন অসন্তুষ্ট হই, তখন শাসক বানাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট জালেম ব্যক্তিটিকে।[47]

•ইমাম বায়হাকি রহ. উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে—মুসা অথবা ইসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, প্রভু! সৃষ্টিকুলের প্রতি আপনার সন্তুষ্ট থাকার আলামত কী? তিনি বললেন, আমি যখন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকি, তখন তাদের ফসল বোনার সময় বৃষ্টিপাত করি এবং ফসল কাটার সময় তা বন্ধ রাখি; সবচেয়ে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোককে তাদের শাসক বানাই এবং তাদের প্রয়োজনীয় টাকাপয়সা ও ধনসম্পদ বড় ও উদার মনের লোকদের হাতে ন্যস্ত করি।

এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আপনার অসন্তুষ্টির আলামত কী? তিনি বললেন : ফসল কাটার সময় বৃষ্টি দিয়ে কষ্টে ফেলি; কিন্তু ফসল বোনার প্রয়োজনের মুহূর্তে বন্ধ রাখি, নির্বোধকে তাদের শাসক বানাই এবং ধনসম্পদের দায়িত্ব দিই সবচেয়ে কৃপণ ও ছোট মনের লোকদের হাতে।[48]

• প্রখ্যাত তাফসিরবিশারদ আল্লামা আলুসি রহ. বলেন —উপরিউক্ত সেই আয়াতটি দিয়ে অনেকে প্রমাণ করেন যে, জনগণ যখন নিজেরা জালেম হয়, আল্লাহ তায়ালা তখন তাদের মতোই আরেক জালেমকে বসিয়ে দেন। হাদিসেও আছে—তোমরা যেমন হবে, তোমাদের শাসকও তেমন হবে।

• হজরত আবু দারদা রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন—আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আল্লাহ। আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি সমস্ত বাদশার মালিক—বাদশাদের বাদশা। সকল শাসকের অন্তর আমার হাতে। বান্দারা যখন আমার বাধ্য হয়ে থাকে, আমি বাদশাদের হৃদয়ে তাদের প্রতি মমতা ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিই; কিন্তু তারা যখন আমার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়, আমি শাসকদের হৃদয়ে তাদের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা ঢেলে দিই। ফলে, তারা তাদের নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন শুরু করে। সুতরাং, বাদশাদের বিরুদ্ধে বদদোয়ায় মত্ত হয়ে পোড়ো না; বরং বিগলিত হয়ে আমার স্মরণে আত্মনিয়োগ করো, আমি তোমাদের জালেম শাসক থেকে উদ্ধার করব।[49]

তাবরানির বর্ণনায় *মাজমাউজ জাওয়ায়েদেও* এমনটি উল্লেখ করা হয়েছে।[50]

• আল্লাহ যখন কোনো জাতির কল্যাণ চান, তখন সবচেয়ে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোককে তাদের শাসক

নিযুক্ত করেন, বিজ্ঞ আলেমগণ তাদের বিবাদ নিরসনের কাজ করেন এবং সবচেয়ে উদার ও বড় মনের মানুষদের হাতে তাদের ধনসম্পদ ন্যস্ত করেন; কিন্তু তাদের অকল্যাণ চাইলে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোককে শাসক বানান, মুর্খ লোকেরা তাদের বিবাদ নিরসনের দায়িত্ব পায় এবং সবচেয়ে কৃপণ লোকদের হাতে সম্পদ দেওয়া হয়।

• আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো সম্প্রদায়ের ওপর রাগান্বিত হন, তাদের ভূমিধস ও শরীর বিকৃত করে শাস্তি দেন না; শাস্তি দেন দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে, বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়ে এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোককে তাদের শাসক হিসেবে চাপিয়ে দিয়ে।[51]

• *মাজমাউজ জাওয়ায়েদে* হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি একে মারফু হিসেবে উল্লেখ করেছেন— আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি যাদের ওপর ক্রুদ্ধ হই, তার থেকে প্রতিশোধ নিই আমার ক্রোধে নিপতিত অন্য লোকদের দিয়ে, এরপর উভয় দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করি।[52]

• আবু উমামা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত—তোমরা শাসকদের গালি দিয়ো না; বরং দোয়া করো তারা যেন সংশোধিত হয়ে যায়। কারণ, তারা সংশোধন হলে তোমরাও সংশোধিত হবে।[53]

• তোমরা তোমাদের হৃদয়কে শাসককে গালি দেওয়ার কাজে লিপ্ত কোরো না; বরং তাদের জন্য কল্যাণের দোয়া করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো। তাহলে আল্লাহ তাদের হৃদয় তোমাদের প্রতি নরম ও দয়ার্দ্র করে দেবেন।[54]

• ইমাম ইবনে আবু শায়বা মালেক ইবনে মিগওয়াল থেকে বর্ণনা করেন—দাউদ আ.-এর জবুর কিতাবে লিখিত আছে, আল্লাহ বলেছেন : আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি বাদশাদের বাদশা। পৃথিবীর সকল শাসকের হৃদয় আমার মুঠোয়। যে সম্প্রদায় আমার অনুগত হয়ে চলে, আমি তাদের প্রতি শাসকের হৃদয় নরম করে দিই; কিন্তু যারা অবাধ্য হয়ে গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে, তাদের ওপর জালেম ও উৎপীড়ক শাসকদের চাপিয়ে দিই। সুতরাং শাসকদের গালমন্দ কোরো না, চাটুকারিতায়ও লিপ্ত হয়ো না। তওবা করে আমার কাছে ফিরে আসো। আমি তোমাদের প্রতি তাদের দয়ার্দ্র করে দেব।[55]

• হজরত আলি রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি স. বলেছেন, মুসলমান যখন আলেমদের ঘৃণা করতে শুরু করবে, মার্কেটে বিশাল বিশাল ভবন নির্মাণ করবে, সম্পদ লাভের জন্য বিয়ে করবে, আল্লাহ তাদের ওপর চার ধরনের আজাব পাঠাবেন—দুর্ভিক্ষ, জালেম শাসক, খেয়ানতকারী বিচারক ও শত্রুর আক্রমণ।[56]

• আবদ ইবনে হুমাইদ হজরত মুআজ ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম খেয়ে বলছি, হয় তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করার দায়িত্ব পালন করবে, না হয় আল্লাহ তোমাদের ওপর নিকৃষ্ট লোকদের শাসকরূপে চাপিয়ে দেবেন, এরপর তোমাদের নেককার লোকেরা দোয়া করবে, কিন্তু তাদের সে ডাক কবুল করা হবে না।[57]

আদ-দুররুল মানসুর ও *আল-জামিউস সগির* গ্রন্থ দুটোতে এ বিষয়ে আরও অনেক বর্ণনা রয়েছে।

• আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রিজিক আসতে দেরি হচ্ছে দেখে তোমরা গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে যেয়ো না। কারণ, আল্লাহর কাছে থাকা রিজিক কেবল তার আনুগত্যের মাধ্যমেই লাভ করা যায়। ইমাম বাগাবি রহ. *শরহুস সুন্নাহ* ও ইমাম বায়হাকি রহ. *শুআবুল ইমানে* হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

• হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আখেরাতের ধ্যানে মশগুল হয়ে থাকে, আল্লাহ তার হৃদয় ধনী বানিয়ে দেন, তার সকল পেরেশানি দূর করে দেন এবং পৃথিবী তার পায়ের কাছে এসে পড়ে থাকে, সে এর দিকে ফিরে তাকাতেও আগ্রহ বোধ

করে না; কিন্তু যে রাতদিন দুনিয়া নিয়ে পড়ে থাকে, আল্লাহ তার চারদিকে দারিদ্র্য সেঁটে দেন এবং তার পেরেশানির শেষ থাকে না। অথচ, পার্থিব জগতের ততটুকুই লাভ করতে পারবে, যতটুকু তার ভাগ্যে লেখা ছিল।[58]

• আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, একদিনের ঘটনা। আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে ছিলাম। তিনি আমাকে ডাক দিলেন—বালক! আমি তোমাকে কিছু কথা বলছি, ভালো করে মনে রাখবে—তুমি সবসময় আল্লাহর হক আদায় করবে, তাহলে আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন। সর্বদা আল্লাহর অনুগত হয়ে চলবে, তাহলে চারদিকে তাকে দেখতে পাবে। যখন কিছু চাইবে, কেবল তাঁর কাছে চাইবে। যখন কোনো সাহায্য প্রার্থনা করবে, শুধুমাত্র তাঁর কাছেই প্রার্থনা করবে। মনে রেখো, পৃথিবীর সকলে মিলে যদি তোমাকে কোনো সাহায্য করতে চায়, তাহলে কেবল সেটুকুই করতে পারবে, যেটুকু তিনি তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর সকলে মিলে যদি তোমার ক্ষতি করতে চায়, তাহলেও ততটুকুই করতে পারবে, যেটুকু তিনি তোমার জন্য পূর্ব থেকে নির্ধারিত করে রেখেছেন। মনে রেখো, ভাগ্য যা লেখার, সব লিখে কলম চিরতরে বন্ধ করে ফেলা হয়েছে এবং পৃষ্ঠাগুলোও শুকিয়ে গেছে।[59]

• হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি স. বলেন—আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, বান্দা যদি আমার অনুগত হয়ে চলত, তাহলে আমি তাদের রাতের বেলা বৃষ্টি দিতাম, দিনের বেলা সূর্য উঠত এবং কখনো তাদের বজ্রপাতের শব্দ শুনতে হত না।[60]

• হজরত আবু জর গিফারি রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি স. বলেন, আমি একটা আয়াত জানি, মানুষ যদি তা আঁকড়ে ধরত, তবে তাদের আর কোনো পেরেশানি থাকত না। সাহাবারা বললেন, কোন আয়াতটি, ইয়া রাসুলাল্লাহ? তিনি বললেন :

ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.

অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তাকে কোনো না কোনো মুক্তির পথ বের করে দেবেন এবং এমন এমন জায়গা হতে রিজিকের ব্যবস্থা করবেন, যা সে কল্পনাও করেনি।[61]

• হজরত হানজালা আল-আসলামি রা. বলেন, একবার আবু বকর রা. খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে মুরতাদদের কাছে পাঠালেন। বলে দিলেন, তুমি তাদের পাঁচটি বিষয়ে আহ্বান করবে। এর একটিও যদি পরিত্যাগ করে, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। ১. দুই সাক্ষ্য—আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসুল। ২. নামাজ আদায়

করা। ৩. জাকাত দেওয়া। ৪. রমজানে রোজা রাখা। ৫. কাবায় গিয়ে হজ পালন করা।[62]

• আবু বকর রা.-এর সময়ে 'আজনাদাইন'-এ রোমকদের সাথে ভীষণ এক যুদ্ধ হল। সে যুদ্ধে এই বিষয়টি ঘটেছিল—রোম সেনাপতি আরবীয় এক লোককে পাঠাল গোয়েন্দা হিসেবে। বলে দিল, তুমি মুসলমানদের খোঁজখবর নিয়ে এসো। সেখানে এক দিন এক রাত অবস্থান করবে। চুপচাপ। কেউ যেন টেরটি না পায়। এরপর আমাকে জানাবে কেমন কী দেখলে। লোকটা তা-ই করল। যেহেতু সে-ও আরব দেশেরই ছিল, তাই বিষয়টা কেউ ধরতে পারেনি।

ফিরে আসার পর সেনাপতি জিজ্ঞেস করল, কেমন দেখলে? সে বলল—খুবই অন্যরকম এরা। রাতের বেলা প্রভুর সামনে মগ্ন থাকে, আর দিনের বেলা বীরসেনানী হয়ে যুদ্ধ করে। তাদের বাদশার ছেলেও যদি চুরি করে, ক্ষমা নেই। আইন অনুযায়ী হাত কেটে দেয়। কেউ যদি জিনা করে, রজম মেরে হত্যা করা হয়। সত্য প্রতিষ্ঠায় আইনের চোখে সবাই সমান।

সব শুনে সেনাপতি বলল, তোমার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে পৃথিবীর বুকে এমন বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে মাটির নিচে চলে যাওয়া উত্তম। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে আল্লাহ যেন তাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ না ঘটান। ফলে, আমাকে এমন যুদ্ধের ভেতরে

পড়তে হবে না, যেখানে তাদের বিরুদ্ধে তিনি আমাকে তো সাহায্য করবেন না, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে তাদের সব রকমের সাহায্য করে আমাকে পরাজিত ও লাঞ্ছিত করবেন।[63]

• সেনাপতিরা আবু বকর ও উমরের কাছে চিঠি লিখে ভয়ানক পরিস্থিতির কথা জানালেন। জবাবে তিনি বললেন, তারা যেন একতাবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত এক বাহিনীতে পরিণত হয়, এরপর মুশরিক বাহিনীর মোকাবেলায় যায়। মনে রেখো, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। যারা আল্লাহকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন এবং কাফেরদের লাঞ্ছিত করেন। সাবধান! সংখ্যাস্বল্পতার কারণে তোমরা কখনো হারবে না; হারবে গুনাহের কারণে। সুতরাং, গুনাহ থেকে বেঁচে থেকো।

• হজরত আবু বকর রা. ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-কে তার সফলতার জন্য শুভেচ্ছা-বাণী পাঠিয়ে সাথে এই নসিহতটিও করেছিলেন, তোমাদের হৃদয়ে কখনো যেন আত্মগর্ব ও মুগ্ধতা না আসে। সাবধান, কখনো নিজের কোনো কাজ নিয়ে গর্ব করবে না। কারণ, গর্ব ও অহংকার কেবল আল্লাহ তায়ালা করতে পারেন এবং তিনিই একমাত্র প্রতিদানকারী।[64]

• হজরত উমর রা. উতবা রা.-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি তোমাকে ভারত ভূমিতে পাঠাতে

চাচ্ছি।... তো, বিসমিল্লাহ বলে সফর শুরু করে দাও। আল্লাহকে সাধ্যমতো ভয় করবে, জনগণের মাঝে ইনসাফের সাথে শাসন করবে, নামাজ সময়মতো আদায় করবে এবং বেশি বেশি জিকির করবে।

• উমর রা. সাদ রা.-কে ডেকে পাঠালেন। হাজির হওয়ার পর তাকে ইরাক যুদ্ধের দায়িত্ব দিয়ে বললেন, হে বনু উহাইবের সাদ! আপনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মামা ও তাঁর সাহাবি—এ নিয়ে কখনো গর্ব করবেন না। মনে রাখবেন, আল্লাহ কখনো গুনাহ দিয়ে গুনাহ মাফ করেন না; বরং গুনাহ মাফ করেন সওয়াবের কাজের বিপরীতে। আল্লাহর সামনে বংশ মর্যাদার কোনো গুরুত্ব নেই। তিনি শুধু দেখেন কার তাকওয়া ও আনুগত্য কেমন। তাঁর চোখে অভিজাত ও সাধারণ সকলেই সমান। আল্লাহ তাদের সকলেরই প্রভু এবং তারা তাঁর বান্দা। গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যমে তারা পরস্পর থেকে সম্মানী হয়ে ওঠে এবং তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হওয়ার পর থেকে অন্তর্হিত হওয়া পর্যন্ত যে দীন নিয়ে এসেছিলেন, সবসময় শুধু এর দিকেই নজর রাখবে। কারণ, এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও একমাত্র বিষয়। তোমার প্রতি এ-ই আমার নসিহত। যদি এসবের প্রতি অনাগ্রহী হয়ে এগুলো পরিত্যাগ করো, তাহলে তোমার সকল আমল বিনষ্ট হবে আর তুমি লাঞ্ছিত হবে।

এরপর যখন তাকে রওয়ানা করানোর মনস্থ করলেন, আবার ডাকলেন। বললেন, আমি তোমাকে ইরাক যুদ্ধের দায়িত্ব অর্পণ করলাম। আমার অসিয়তগুলো ভালোভাবে মনে রাখবে। কারণ, তুমি খুব কঠিন ও ভয়াবহ একটি দায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছ। এতে কেবল সত্যই জয়ী হবে। তাই তুমি ও তোমার সাথি —সকলে কল্যাণমূলক কাজে মশগুল থাকবে। একেই নিজের অভ্যাসে পরিণত করে নেবে এবং এ দিয়েই বিজয় ছিনিয়ে আনবে। আর মনে রাখবে, সকল অভ্যাসেরই একটি করে বৈশিষ্ট্য থাকে, যা এটিকে স্থির করে ধরে রাখে। কল্যাণকাজের বৈশিষ্ট্য হল সবর।

সুতরাং তোমাদের ওপর যে বিপদাপদ আসবে তাতে ধৈর্যধারণ করবে। আল্লাহর ভয় তোমার ভেতরে সৃষ্টি হোক। এটি সৃষ্টি হয় দুটি কাজের দ্বারা—এক. আল্লাহর আনুগত্য, দুই. গুনাহের কাজ থেকে দূরে থাকা। আর এ কথা সুনিশ্চিত—আল্লাহর আনুগত্য করতে হলে দুনিয়াবিমুখ হতে হবে এবং আখেরাতকে ভালোবাসতে হবে। আর যারা তাঁর অবাধ্য হয়, তারা অবাধ্য হয় আখেরাতবিমুখ হয়ে দুনিয়াকে ভালোবেসে। হৃদয়ের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, যা মানুষকে সুন্দর মানুষে পরিণত করে। এগুলো আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে বান্দার হৃদয়ে সৃষ্টি করেন। এর কিছু প্রকাশ্য, কিছু গোপন। প্রকাশ্য তত্ত্বটি হল— সত্যের প্রশ্নে প্রশংসাকারী ও নিন্দুক—উভয়েই

বরাবর। আর গোপন তত্ত্বটি বোঝা যায় যখন তার হৃদয়ের প্রজ্ঞা তার মুখের শব্দ দিয়ে প্রকাশিত হয় এবং সে মানুষকে ভালোবাসে। সুতরাং ভালোবাসায় কার্পণ্য কোরো না। নবিগণকে তাদের ভালোবাসার বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হবে। আর, আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন, তখন মানুষের মনেও তার প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দেন। এমনিভাবে যখন কোনো বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন আল্লাহর নির্দেশ ও ইশারায় মানুষও তাকে ঘৃণা করতে থাকে। সুতরাং তুমি আল্লাহর কাছে কতটুকু প্রিয় তা মানুষ তোমাকে কেমন ভালোবাসে তা দিয়ে পরিমাপ করে নিয়ো।[65]

• হজরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. বলেন, আমি বিশটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি, কিন্তু ইয়ামামার যুদ্ধের দিন বনু হানিফার চেয়ে জেদি কোনো বাহিনী পাইনি। এরা তরবারির সামনে দাঁত কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, নিজেরাও তরবারি চালায় ভয়াবহভাবে এবং সহজে পিছু হটে না। ঘটনা হল এই—নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার তুলাইহা বাহিনীকে পরাজিত করে ফিরে আসছিলাম। তুলাইহার বাহিনীর কাছে শক্তি বলতে কিছুই ছিল না। এখানের অভিযান শেষ করে আমরা যাচ্ছিলাম বনু হানিফার দিকে। এ সময় আমার মুখ দিয়ে একটি কথা বেরিয়ে গেল। আর বিপদ তো কথার পিঠেই লুকিয়ে থাকে, এখানেও তা-ই হল। কিছুটা গর্বের সাথে বলে ফেললাম—বনু হানিফা আর এমন কী! তুলায়হার বাহিনীর মতোই নিতান্ত দুর্বল

একটি দল। এরপর ময়দানে নেমে টের পেলাম কারও সাথেই এরা মেলে না। ভীষণ দুর্ধর্ষ একটি বাহিনী। সূর্যোদয় থেকে নিয়ে একদম আসর পর্যন্ত টিকে রইল। এরপর হার মানল।[66]

সাধারণ একটি কথা বলে ফেলার কারণেই যদি এ অবস্থা হয়, তাহলে আমরা আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে কীভাবে সাহায্যের আশা করতে পারি।

• সাদ রা. বলেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁর বন্ধুকে সাহায্য করবেন, তাঁর দীনকে বিজয়ী করবেন, শত্রুকে পরাজিত ও অপদস্থ করবেন, যদি সৈন্যবাহিনীতে পুণ্যের চেয়ে পাপ ও অবাধ্যতার পরিমাণ বেশি না হয়।[67]

• সাদ কাদেসিয়ায় অবতরণ করলেন। সেখানে অবস্থান করলেন এক মাস। দীর্ঘ এই সময়ে পারস্যে একজনের দেখাও মিলল না। এরপর তিনি আসেম ইবনে আমরকে মাইসানে পাঠালেন। সেখানে তিনি লোকদের কাছে একটি বকরি বা গরু চাইলেন; কিন্তু কেউ দিতে রাজি হল না। নানা টালবাহানা করে এড়িয়ে গেল। এরপর আসেম একটা ঝোঁপের পাশে এক লোককে পেলেন। তাকেও জিজ্ঞেস করলেন গরু বা বকরি আছে কি না। সেও জবাব দিল, আমি জানি না। ইত্যবসরে ঝোঁপটির আড়াল থেকে একটা গরু ডেকে উঠল—এই তো আমরা এখানে আছি। আল্লাহর এই শত্রুটি মিথ্যা বলেছে। এ কথা শুনে তিনি

সেখানে প্রবেশ করে গরুটিকে হাঁকিয়ে নিয়ে এলেন। মুসলিম বাহিনীর কাছে ফিরে আসার পর সাদ রা. গরুটি জবাই করে গোশতগুলো সকলের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। তারা সে গোশত বেশ কিছু দিন রেখে রেখে নিজেদের খাদ্য চাহিদা পূরণ করলেন।

হাজ্জাজের সময়ে হাজ্জাজ যখন এই ঘটনা শুনলেন, তখন বেশ অবাক হলেন এবং ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য ওই দিনের ঘটনায় উপস্থিত কয়েকজনকে ডেকে আনলেন।

তারা খুব জোর দিয়ে বললেন, ঘটনা সত্য। তারা এটি নিজেরা শুনেছেন এবং স্বচক্ষে দেখেছেনও। হাজ্জাজ বিশ্বাস করতে চাইলেন না। বললেন, তোমরা সম্ভবত মিথ্যা বলছ। তারা অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বললেন, এটা আপনি বলতে পারতেন যদি ঘটনাস্থলে আপনি হাজির থাকতেন আর আমরা থাকতাম অনুপস্থিত। কিন্তু হয়েছে তো উলটো। তাহলে মিথ্যা দাবি করছেন কী করে! তাদের দৃঢ়তা থেকে হাজ্জাজ স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, মেনে নিচ্ছি আপনারা সত্যই বলেছেন। এই অবাক কাণ্ড দেখে সেখানের লোকজনের প্রতিক্রিয়া কী ছিল? তারা বললেন, লোকেরা এটাকে একটি সুসংবাদ হিসেবে দেখেছে এবং আল্লাহ আমাদের ওপর সন্তুষ্ট আছেন আর আমাদের শত্রুরা পরাজিত হবে—এ ব্যাপারে একে একটি উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছে। হাজ্জাজ বললেন, এমন ঘটনা এমনি এমনি ঘটে না। ঘটে

তখনই, যখন বাহিনীর সকলে নেককার ও মুত্তাকি হয়। হাজ্জাজের এই কথা শুনে তারা বললেন, তাদের অন্তরে কী ছিল তা তো আমরা জানি না; তবে বাহ্যিকভাবে আমরা যা দেখেছি, এমন দুনিয়াবিমুখ লোকজন ইতঃপূর্বে আমরা আর পাইনি। তাদের মধ্যে কেউ ভীরু ছিল না, নির্লজ্জ ছিল না, গাদ্দারও ছিল না।[68]

• বাদশা হেরাক্লিয়াসের অনুগত এক লোক মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়েছিল। সে যখন মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে গেল, বাদশা তাকে জিজ্ঞেস করল—মুসলমানদের ব্যাপারে আমাকে কিছু ধারণা দাও। সে বলল, আমি খুব পরিষ্কার বিবরণ দেব। এমন যে, যেনবা আপনি তাদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। আমি দেখেছি—দিনের বেলা এরা একেকজন ভীষণ লড়াকু যোদ্ধা, কিন্তু রাত হলে সে তারাই ভীরুকম্পিত হৃদয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রুতে বুক ভাসায়। মূল্য আদায় না করে কারও থেকে জোরপূর্বক কিছু ছিনিয়ে নেয় না এবং সালাম না দিয়ে কোথাও প্রবেশ করে না। তাদের সাথে যারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তারা তাদের পরাজিত করে ছাড়ে। এসব শুনে হেরাক্লিয়াস বলল, তুমি যা শোনালে, তা-ই যদি সত্য হয়, তাহলে অচিরেই তারা আমার দাঁড়ানোর এই জায়গাটিও কবজা করবে।[69]

উপস্থিত মাথায় যে আয়াত ও হাদিসগুলো এসেছে, এখানে সেগুলোই উল্লেখ করা হল। অন্যথায় খুঁজে খুঁজে সবগুলো লিখতে গেলে শুধু এসব নিয়েই বড়সড় একটি বই হয়ে যাবে। এসবের কোনোটিতে সফলতার শর্ত হিসেবে সরাসরি তাকওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে, কোনোটিতে তাকওয়া যে বিষয়গুলো দাবি করে, তা উল্লেখ হয়েছে। যেমন, আল্লাহর প্রতি ইমান, তাঁর সাথে গভীর সম্পর্ক, তাওয়াক্কুল, সবর, দৃঢ়তা ইত্যাদি।

সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের মতো আরও যারা প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপে আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশনা সবার আগে সামনে রাখতেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও হুকুমকে সকল রাজনীতি ও সকল বিশেষ কল্যাণ বিবেচনার ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন, আল্লাহ তায়ালা তাদের সর্বত্র বিজয়ী করেছেন এবং জাগতিক সমস্ত উপায়-উপকরণের বিপরীতে এমন সব মাধ্যমে সাহায্য করেছেন, যেগুলোর কথা আমরা ভাবতেও পারি না। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

১. সিংহের আত্মসমর্পণ

ইবনুল মুনকাদির থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম সাফিনা রা. রোম দেশে একবার নিজ সৈন্যদল হারিয়ে ফেললেন, অথবা তাকে বন্দি করা হয়েছিল। তিনি যখন শত্রুর হাত থেকে পালিয়ে নিজের লোকদের তালাশ করছিলেন, তখন হঠাৎ একটা সিংহের সামনে পড়ে গেলেন। সাফিনা রা. সিংহকে বললেন, হে সিংহ, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম। নিজের সৈন্যদলের লোকদের খুঁজে পাচ্ছি না। এ কথা শুনে সিংহটি একটু এগিয়ে এসে অনুগত হয়ে লেজ নাড়াতে লাগল। একসময় এসে দাঁড়াল তার পাশে, এরপর তাকে নিয়ে চলতে লাগল। পথে যখনই কোনো আওয়াজ শুনতে পায়, সিংহটি সেদিকে এগিয়ে যায়। এরপর আবার তার পাশে এসে চলতে থাকে। এভাবে সারা পথ তাকে পাহারা দিয়ে এবং রাস্তা চিনিয়ে মুসলিম বাহিনীর কাছে পৌঁছে দেয়, অতঃপর নিজের পথে ফিরে যায়।[70]

২. বশীভূত হল বনের পশুরা

হজরত মুআবিয়া রা.-এর শাসনামলের ঘটনা। আফ্রিকা বিজয়ের পর হজরত উকবা ইবনে নাফে রহ. 'কায়রোয়ান' নামে সেখানে নতুন এক শহর গড়ে

তোলেন, জিহাদের সুবিধার্থে, শহরের গোড়াপত্তনের কাহিনি এটি :

হজরত উকবা রা. তখন সাথিদের একত্র করে বললেন, এই দেশের লোকদের চরিত্রের ঠিক নেই। যখন তরবারি তাদের কাবু করে ফেলে, তখন ইসলাম গ্রহণ করে; কিন্তু যখনই মুসলমানগণ তাদের রেখে চলে যায়, তখন তারা আবার নিজেদের আগের জীবনধারা ও পুরোনো ধর্মে ফিরে যায়। সুতরাং, মুসলমানগণ তাদের সমাজের ভেতরে গিয়ে মিলেমিশে থাকুক এটা আমার কাছে ভালো মনে হচ্ছে না। ভেবে দেখেছি আমরা এখানে নিজেদের জন্য আলাদা এক শহর গড়ে তুলব, এটাই ভালো হবে। এ কথা শুনে সকলেই তাতে সমর্থন দিল। এরপর সবাই কায়রোয়ান এলাকায় উপস্থিত হল। এটি ছিল সমুদ্র থেকে দূরে স্থলভাগের এক প্রান্তে। ঘন জঙ্গলপূর্ণ একটি জায়গা। নিবিড় গাছপালার কারণে এমনকি সাপও চলাচল করতে পারত না তাতে। তিনি বললেন, আমি এই জায়গা নির্বাচন করেছি সমুদ্র থেকে দূরে হওয়ার কারণে। এতে রোমান নৌযানগুলো অতর্কিতে শহরটি ধ্বংস করতে পারবে না। জায়গাটি ছিল দেশের ঠিক মধ্যভাগে। এরপর তিনি সাথিদের নগর নির্মাণ কাজ শুরু করতে আদেশ দিলেন। সাথিগণ জানালেন, খুবই বিপদসংকুল জঙ্গল এটা। অনেক হিংস্র জন্তু ও কীটপতঙ্গ আছে। আমরা মৃত্যুর মুখে পড়তে পারি। উকবা রা. ছিলেন দোয়া-

কবুল মানুষ। তাদের আশঙ্কার কথা শুনে তিনি বাহিনীতে থাকা সাহাবিদের একত্র করলেন। সংখ্যায় তারা আঠারো জন। এরপর তিনি ডাক দিয়ে বললেন, হে জঙ্গলের কীটপতঙ্গ ও হিংস্র পশুর দল, আমরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি। আমরা এখানে অবস্থান করব। তোমরা অন্য কোথাও চলে যাও। এরপর তোমাদের যাকেই পাওয়া যাবে, হত্যা করা হবে। এরপর মানুষ খুবই অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটতে দেখল। দেখল হিংস্র পশু, বাঘ ও সাপেরা নিজেদের বাচ্চা মুখে মুখে নিয়ে দলে দলে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই অবাক করা ঘটনাটি স্থানীয় লোকদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করল এবং তারা ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর তিনি রাজ্য পরিচালনার জন্য নিজের একটি বাড়ি নির্মাণ করলেন, অন্যরাও তার চারপাশে ঘরবাড়ি নির্মাণ করল। এই ঘটনার পর সেখানে তারা ৪০ বছর বসবাস করেছেন। দীর্ঘ এই সময়ে সেখানে কেউ একটি সাপ-বিচ্ছুও দেখতে পায়নি।[71]

3. মাদায়েন ও কিসরার রাজ্যজয়

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. যখন আর্দাশির বিজয় শেষে স্থির হলেন—সময়টা ছিল সফর মাস—দেখলেন এলাকায় জনমানুষ বলতে কেউ নেই। চারদিক খাঁখাঁ করছে। এমনকি গনিমত হিসেবে নেওয়ার মতো কোনো সম্পদও নেই। এখানের মানুষেরা সমস্ত

মালামাল নিয়ে নৌকায় চড়ে মাদায়েন চলে গেছে। নৌকাগুলোও আটকে রেখেছে। ফলে, সাদ রা. পার হওয়ার মতো কিছুই পেলেন না। অবস্থা এমন যে, অনেক চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত পারাপারের কোনো উপায় হল না।

দজলা তখন উত্তাল হয়ে আছে। কালচে রঙা পানিতে ভয়ংকর লাগে দেখতে। পানি বেশি হওয়ায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে তৈরি হচ্ছে প্রচুর ফেনা। এদিকে সাদ রা. সংবাদ পেলেন তৎকালের কিসরা ইয়াজদাগিরদ সমস্ত ধনসম্পদ মাদায়েন থেকে সরিয়ে হুলওয়ান শহরে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। তিন দিনের ভেতর ধরতে না পারলে সব হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং পুরো ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তখন সাদ রা. দজলার তীরে মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে উদ্দেশ্য করে তেজস্বী এক ভাষণ দিলেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন এরপর বললেন, তোমাদের শত্রুরা তোমাদের থেকে নিজেদের এই সমুদ্রের মাধ্যমে নিরাপদ করে নিয়েছে। সুতরাং, মাঝখানে এই সমুদ্র রেখে চাইলেই তাদের কাছে পৌঁছতে পারছ না। কিন্তু তারা ঠিকই যখন ইচ্ছা তোমাদের কাছে চলে আসতে পারবে। এরপর নৌকাতে বসে বসেই দূর থেকে তোমাদের ঘায়েল করবে। এদিকে তোমাদের পেছন দিক সম্পূর্ণ নিরাপদ। সেখান থেকে কোনো বিপদ আসার ভয় নেই।

আমি দেখেছি, এই সংকটকালটি আসার আগে তোমরা শত্রুর সাথে লড়াই করার জন্য মনে মনে উদগ্রীব হয়েছিলে। শোনো, প্রতিজ্ঞা করলাম, আমি এই সমুদ্র পাড়ি দিয়েই তাদের কাছে পৌঁছব।

তার কথা শুনে সবাই উদ্দীপ্ত হল এবং সমস্বরে বলে উঠল, তবে তা-ই করুন। আল্লাহ আমাদের ও আপনাকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সবসময় পথ দেখাবেন।

এ কথা শোনার পর সাদ রা. সবাইকে সাগর পাড়ি দিতে আহ্বান করলেন। বললেন, নদীর ওই পাড়টা দখলে নিয়ে সবাইকে নিরাপদে পার হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। কে আগে যাবে?

আসেম ইবনে উমর ও দুঃসাহসী কয়েকজন বীরপুরুষ এগিয়ে এলেন। তারা ছিলেন সংখ্যায় ছয়শ'র মতো। সাদ রা. আসেম রা.-কে তাদের আমির নিযুক্ত করলেন। তারা সকলে গিয়ে দাঁড়ালেন দজলার একেবারে কিনারা ঘেঁষে। এ সময়ে আসেম রা. দ্বিতীয় আরেকটি ঘোষণা দিলেন—আমার সাথে কে আসবে? আমরা সকলের আগে এই সমুদ্রে ঢুকব এবং ওই পারে নদীর পাড় দখলে নেব। তখন সে ছয়শ জন থেকে ষাট জনের একটি দল সামনে এল। শত্রুবাহিনী তখন অপর পাড়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। লোকজন যখন পানিতে নামতে একটু ভয় ভয় করছিল, তখন মুসলমানদের সাহসী একজন খুব জোশের সাথে এগিয়ে এল, বলল, এই সামান্য

পানিকে তোমরা ভয় পাও? এরপর সে তেলাওয়াত করল وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে বলছেন, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো প্রাণ মৃত্যুবরণ করতে পারবে না। মৃত্যুর সময় নির্ধারিত।[72] এ আয়াত পড়ে সে নিজের ঘোড়া সমুদ্রে ছুটিয়ে দিল। এতে অন্যরাও উত্তেজিত ও উৎসাহী হল এবং নিঃশঙ্ক চিত্তে সমুদ্রের ভেতর ঢুকে পড়ল।

ষাট জনের দলটি দুই ভাগে বিভক্ত হলেন; নর ঘোড়ায় যারা আছে তারা এক দলে আর মাইদ ঘোড়ার লোকজন অপর দলে। অপর পার থেকে ইরানিরা যখন দেখল লোকগুলো পানির ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল—দানব! দানব! কেউ কেউ বলল—পাগল! পাগল! এ কথাও বলল—আল্লাহর কসম, তোমরা আসলে মানুষদের সাথে যুদ্ধ করছ না; এরা জিন ছাড়া কিছু নয়। অতঃপর তারা একদল অশ্বারোহী পাঠাল যেন মুসলিমদের এই অগ্রগামী বাহিনীকে পানি থেকে বের হতে না দেয়। আসেম তার সাথিদের বললেন, বর্শাগুলো ভালোভাবে তাক করে ধরো এবং দেখে দেখে ঠিক চোখ বরাবর মারো। সবাই তা-ই করলেন। মুসলমানদের তীক্ষ্ণ বর্শাগুলো ইরানিদের ঘোড়ার চোখে বিঁধতে লাগল। শেষে দেখা গেল তারা মুসলমানদের সামনে খুব বেকায়দা অবস্থায় পড়ে গেল। ঘোড়াগুলোকে

কোনোভাবেই সামলাতে পারছিল না। ইত্যবসরে মুসলিম বাহিনী সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এলেন। শত্রু বাহিনী পালাতে লাগল এবং আসেম ও তার সঙ্গীরা পেছন থেকে ধাওয়া করে এই প্রান্ত থেকে হটিয়ে দিলেন। সমুদ্র পাড়টি শত্রুমুক্ত হওয়ার পর ছয়শ সঙ্গীর অবশিষ্টরা নদী পার হয়ে এলেন। এসে যোগ দিলেন এপারের সাথিদের সাথে। এরপর সবাই মিলে যুদ্ধ করে এ পাড় থেকে অশ্ববাহিনীকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করলেন। তারা এই দুই ক্ষুদ্র দলের প্রথমটিকে 'কুতাইবাতুল আহওয়াল' ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্র দলটিকে 'কুতাইবাতুল খারসা' নামে অভিহিত করেন। প্রথম দলটির নেতৃত্বে ছিলেন আসেম, দ্বিতীয় দলটির নেতৃত্ব দিয়েছেন কাকা ইবনে আমর রা.।

সাদ ও তার সঙ্গী মুজাহিদরা দজলার অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন নদী পার হয়ে তাদের যোদ্ধারা অশ্ববাহিনীকে কীভাবে তছনছ করে দিচ্ছিল। এরপর সাদ রা. বাকিদের নিয়ে নদীতে নেমে পড়লেন। ততক্ষণে অপর প্রান্তে সহযোদ্ধাদের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি হয়ে গেছে। নদীতে নামার সময় সাদ সকলকে বলে দিলেন প্রত্যেকেই যেন এই দোয়াটি পড়ে :

نستعين بالله. ونتوكل عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

আমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করছি, তার ওপর ভরসা করছি। তিনি আমাদের জন্য

যথেষ্ট এবং কতই না উত্তম অভিভাবক। এবং সুমহান ও সুউচ্চ আল্লাহর শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতীত আর কোনো শক্তি নেই।

নদীতে তারা এমনভাবে চলতে লাগলেন, মনেই হয় না নদী; মনে হয় যেন সমতল ভূমিই। নদীর এপারওপাড় ছেয়ে গেল মুসলিম সৈন্যবাহিনীতে। অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর কারণে পানি দেখা যাচ্ছিল না। সৈন্যবাহিনী পরস্পর কথাবার্তা বলতে বলতে হাঁটছে, যেন জলে নয়, তারা মাটিতেই আছে। এটা হতে পেরেছে এজন্যই যে, তাদের মনে কোনো ভয় বা দ্বিধা ছিল না। ছিল ঐশী নিরাপত্তাবোধ, ইমানি প্রশান্তি, আল্লাহর ওয়াদায় গভীর বিশ্বাস, তাঁর সাহায্য ও বিজয়ের ব্যাপারে সীমাহীন প্রত্যয়। উপরন্তু তাদের সাথে আছে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া বিশেষ দশজন সাহাবির একজন—সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন, তার জন্য দোয়া করেছেন। বলেছেন, আল্লাহ, আপনি তার দোয়া কবুল করুন এবং তার নিক্ষেপকে নিশানা ভেদ করিয়ে দিন।

সুতরাং, নির্দ্বিধায় বলা যায় সেদিন তিনি তার বাহিনীর জন্য নিরাপত্তা ও বিজয়ের দোয়া করেছেন এবং তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা করেই তাদের সে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছেন; ফলে, আল্লাহ তাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং আপন সাহায্যে শক্তি বাড়িয়ে

দিয়েছেন। এজন্য দেখা যায় সেদিন একজন মুসলমানকেও জীবন দিতে হয়নি। শুধু গারকাদা আল বারেকি নামে একজন তার লাল ঘোড়াটি থেকে পড়ে যাচ্ছিলেন, কাকা ইবনে আমর ঘোড়ার লাগাম ধরে সামলে রাখেন এবং লোকটির হাত ধরে আবার ঘোড়ার ওপর স্থির করে বসান। পরে লোকটি মন্তব্য করেছেন, কাকা ইবনে আমরের মতো আরেকজন জন্ম দিতে পৃথিবীর মায়েরা অক্ষম।

এমনকি সেদিন মুসলমানদের কোনো জিনিসপত্রও নষ্ট হয়নি। শুধু মালেক ইবনে আমর নামে এক ব্যক্তির একটি কাঠের পাত্র নদীর ঢেউ নিয়ে যাচ্ছিল। এর হাতলটা ছিল দুর্বল। লোকটি সাথে সাথে দোয়া করল—আল্লাহ, আপনি তাদের সাথে থাকা অবস্থায় আমার কোনো জিনিস যেন হারিয়ে না যায় সে ব্যবস্থা করে দিন। ফলে, নদী তার জিনিসটি তাদের গন্তব্যের পাড়ে পৌঁছে দেয়। এরপর কোনো একজন সেটা কুড়িয়ে তার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

পানির ওপর চলতে গিয়ে কোনো ঘোড়া যখন ক্লান্ত হয়ে যেত, আল্লাহ তার জন্য উঁচুমতো একটি জলের ঢিবি বানিয়ে দিতেন, ঘোড়াটি সেখানে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিত এবং সকল ক্লান্তি ঝেড়ে আবার চলতে শুরু করত। সেদিন এমনকি নদীর প্রমত্ত জল ঘোড়াগুলোর বেল্ট পর্যন্তও পৌঁছায়নি। বড় অদ্ভুত এক দিন ছিল এটি। মানুষের বোধবুদ্ধি নিশ্চল, বিমূঢ় ও স্তম্ভিত করে দেওয়ার এই ঘটনাটি ঘটেছিল

দিনেদুপুরে, সকলের চোখের সামনে। অবিশ্বাস্য! আল্লাহর বিশেষ এক কুদরত আকাশ হতে নেমে এসেছিল ধুলোর পৃথিবীতে। আল্লাহপ্রদত্ত প্রাকৃতিক কোনো নিয়ম দিয়েই একে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এ ছিল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের সত্যতা প্রমাণকারী বড় এক মোজেজা, যা আল্লাহ তায়ালা নবিজির সাহাবিদের সম্মানে ঘটিয়েছিলেন, পারস্যের মাটিতে। সে দেশের কোথাও আর এমনটি ঘটেনি, এমনকি পৃথিবীর কোথাও না; শুধু পেছনে উল্লেখ করা আলা ইবনে হাজরামির ঘটনাটি এমন ছিল। কিন্তু সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের ঘটনা তার চেয়েও বহু গুণে বেশি কিছু। কারণ, এই বাহিনীটি সেই বাহিনীর চেয়ে অনেক গুণ বড় ছিল। সেদিন সাদ রা.-এর সাথে বিশেষ আরেকজন সাহাবি ছিলেন—হজরত সালমান ফারসি রা.। পানির ওপর দুজন পাশাপাশি যাচ্ছিলেন, এমন সময় সাদ রা. বলতে লাগলেন, আল্লাহ তায়ালাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই সবচেয়ে উত্তম অভিভাবক। তাঁর সত্তার কসম, তিনি তাঁর বন্ধুকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। আপন দীনকে করবেন বিজয়ী এবং এ দীনের শত্রু যারা, তাদের করবেন পরাজিত ও লাঞ্ছিত, শর্ত একটিই—যদি বাহিনীতে কোনো অবাধ্য ও পাপী না থাকে অথবা পুণ্যের চেয়ে পাপের পরিমাণ বেশি না হয়। তখন সালমান রা.-ও বললেন, ইসলাম এই পৃথিবীতে নতুন এসেছে।

আল্লাহর কসম, তিনি এর অনুসারীদের জন্য সমস্ত সাগর সুগম করে দেবেন, যেমন অবাধ করে দিয়েছেন স্থলভাগ। সালমানের প্রাণ যার হাতে, সে পবিত্র সত্তার কসম, তারা সদলবলে এই সমুদ্রসম নদী ভেদ করে নিরাপদে বেরিয়ে যাবে, যেমন দলে দলে প্রবেশ করেছিল তাতে, নির্ভয়ে। পরবর্তী সময়ে তা-ই হয়েছে, সালমান যেমন বলেছিলেন। সবাই নিরাপদে পার হয়ে গেছে প্রমত্তা নদীটি, কোনো প্রাণহানি হয়নি, কোনো জিনিসও হারায়নি।

মুসলিম সৈন্যরা যখন সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এল, তাদের ঘোড়াগুলো তখন হ্রেষা ধ্বনি তুলে চুল ঝাড়ছিল। এরপর তারা শত্রুদের পিছু পিছু মাদায়েন শহরে প্রবেশ করল। কিন্তু শহরটিতে কেউ নেই। সম্রাট কিসরা পরিবারপরিজন নিয়ে পালিয়ে গেছে। সাথে নিয়ে গেছে ধনসম্পদ তৈজসপত্র শস্যাদি—যতটুকু সম্ভব। নিতে না পেরে পেছনে ফেলে গেছে মূল্যবান অনেক জিনিস—চতুষ্পদ জন্তু কাপড়চোপড় পাত্র ও তৈজসপত্র তৈল ইত্যাদি। কিসরার ধনভান্ডারে তিন হাজার কোটি দিনার ছিল। কিসরা সেখান থেকে সাধ্যমতো নিয়ে গেছে, অর্ধেক বা কাছাকাছি অংশ না পেরে ফেলে গেছে।

মাদায়েন শহরে সর্বপ্রথম প্রবেশ করল কুতাইবাতুল আহওয়াল নামক প্রথম দলটি। এরপর কুতাইবাতুল খারসা। মুসলিম সে শহরের পথে পথে টহল দিল, কিন্তু কারও দেখা পাওয়া গেল না, কাউকে

ভয় পেতেও হল না; সাদা প্রাসাদটি ছিল ব্যতিক্রম। সেখানে শত্রু বাহিনীর যোদ্ধারা ছিল। সাদ রা. যখন পুরো বাহিনী নিয়ে হাজির হলেন, সাদা প্রাসাদে অবস্থিত দলকে পরপর তিন দিন আত্মসমর্পণের জন্য বললেন। এ কাজে দূত হিসেবে ছিলেন হজরত সালমান ফারসী রা.। তৃতীয় দিন তারা নেমে এল। পরবর্তী সময়ে সাদ রা. এই প্রাসাদটিতে বসবাস করেছেন এবং ফটকের জায়গাটিকে বানিয়েছিলেন নামাজের স্থান। তিনি যখন বিজয়ী বেশে প্রাসাদে প্রবেশ করছেন, এই আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলেন :

كم تركوا من جنات وعيون • وزروع ومقام كريم
• ونعمة كانوا فيها فاكهين • كذلك وأورثناها قوما
آخرين[73]

এরপর মূল ফটকের কাছে গেলেন এবং বিজয়ের শুকরিয়াস্বরূপ আট রাকাত নামাজ আদায় করলেন। বর্ণনাকারী সাইফ উল্লেখ করেন, পুরো আট রাকাত তিনি এক সালামে আদায় করেছেন। এ বছরেরই সফর মাসে তিনি প্রাসাদের সামনের সদর দরজার কাছে সবাইকে নিয়ে জুমআর নামাজ আদায় করেন। এটিই ছিল ইরাকে সংঘটিত প্রথম জুমআ।

কারণ, সাদ রা. সেখানে অবস্থানের এরাদা করলেন এবং মুসলিম পরিবারগুলোর কাছে সংবাদ পাঠিয়ে এখানে এসে বসবাস করার জন্য আমন্ত্রণ

জানালেন। একসময় তারা জুলুলা তিকরিত মুসেল শহরগুলো বিজয় করেন, তারপর কুফা চলে যান।

এরপর তিনি কিসরার পিছু পিছু অনেকগুলো ছোট দল পাঠালেন। একটি বাহিনী তাদের সদলবলে পাকড়াও করে সেখানেই হত্যা করে, অনেকে পালিয়ে যায়। কিসরা থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ পাওয়া যায়। বেশির ভাগই ছিল কিসরার নিজের পরিধেয় কাপড়, মুকুট ও অলংকার। হজরত সাদ রা. সেখানকার বিপুল সম্পদরাজি একত্র করতে লাগলেন। কী বিপুল সে সম্পদ। অমূল্য, অসীম, অবর্ণনীয়।

পেছনে আমরা বলেছি, সেখানে চুনা পাথরের অনেক মূর্তি ছিল। সাদ একটি মূর্তির দিকে তাকালেন, দেখলেন, সেটি বিশেষ এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আছে। দেখেই বুঝতে পারলেন এখানে রহস্য আছে। আঙুলের নির্দেশ ধরে তালাশ করতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে টের পেলেন, যা ভাবছিলেন তা-ই। পূর্ববর্তী কিসরাদের বিরাট এক ধনভান্ডারের সন্ধান পাওয়া গেল। একে একে বের করে আনলেন অগণিত অমূল্য ও অতুলনীয় সম্পদরাজি। মুসলমানগণ সমস্ত সম্পদ একত্র করলেন। পৃথিবীর কেউ এর আগে এমন আশ্চর্য ধনভান্ডার দেখেনি। রীতিমতো বাকরুদ্ধ হয়ে যাওয়া ঘটনা। সেসবের একটি ছিল কিসরার মুকুট। পুরো মুকুট দামি অলংকার দিয়ে সুশোভিত। দেখলে যে কারও চোখ

কপালে উঠে যাবে। কোমরবন্ধনীটিও এমনই ছিল। আরও আছে তার তরবারি, আবা, কার্পেট ইত্যাদি। ফটকটি ছিল দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ষাট গজ। পুরোটা জুড়ে কার্পেট বিছানো ছিল। অমূল্য সে কার্পেট স্বর্ণ-রুপা, মণিমুক্তা ও দামি দামি পাথর দিয়ে কারুকার্যখচিত। কার্পেটজুড়ে অঙ্কিত ছিল তার রাজত্বের সকল অঞ্চলের সুস্পষ্ট ম্যাপ। কোথায় কোন শহর, নদী, দুর্গ, কোষাগার, খেতখামার এমনকি গাছপালাসহ সচিত্র নকশা। কিসরা এসে তার রাজসিংহাসনে বসত। মাথার মুকুটটি বেশি বড় আর ভারী হওয়ায় স্বর্ণের মোটা একটা চেইন দিয়ে মাথার ওপর ঝোলানো থাকত। পর্দাঘেরা অবস্থায় তার মাথায় মুকুটটি চড়িয়ে দেওয়ার পর যখন পর্দা সরানো হত, সভাসদবৃন্দ সকলে তার সামনে সেজদায় পড়ে যেত। কিসরা সীমাহীন দর্প নিয়ে বসে আছে, বিশাল আসনটিতে, কোমরে উজ্জ্বল বন্ধনী, বিশাল তরবারি, দামি পাথরখচিত আবা, এরপর সে ধীরেসুস্থে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একটি একটি করে রাজ্যের খবর নিত। কোথায় কী ঘটল, দায়িত্বশীল গভর্নর দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করছে কি না। সংবাদ শোনানোর জন্য নির্দিষ্ট লোক নিয়োগ ছিল। তারা সবিস্তারে সব বলত তাকে। রাজ্য পরিচালনার এ কাজে কিসরা কখনোই গাফলতি করত না। ম্যাপের নকশা করা এই গালিচা তার সামনে বিছানো থাকত খোঁজখবর নেওয়া ও রাজ্য পরিচালনার সুবিধার্থে। রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্রে তাদের

এই পদ্ধতি খুবই সুন্দর এক সংযোজন। কিন্তু, কিসরার এই দম্ভ ও প্রতিপত্তি বহাল রইল না। আল্লাহ যখন চান, যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেন, যাকে ইচ্ছা পথের ভিখারি বানান, কখনো চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেন। কিসরাকেও এ নিয়মের কাছে হার মানতে হয়েছে। তার সমস্ত রাজ্য হাতছাড়া হয়ে গেল, ধনসম্পদ সব হারিয়ে সে কপর্দকহীণ নিঃস্ব অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিল। সকল রাজ্য, সকল সম্পদ ও সকল ক্ষমতা আল্লাহ দিলেন মুসলমানদের হাতে। সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা কেবল আল্লাহরই জন্য এবং সমস্ত দানও তাঁরই করুণা ও একান্ত অনুগ্রহ।[74]

4. আলা হাজরামি রা.-এর অব্যর্থ দোয়া

হজরত আবু বকর রা. আলা হাজরামি রা.-এর অধীনে একদল লশকর পাঠালেন বাহরাইনের মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য। পথে খুবই শুষ্ক এক ময়দান পড়ল। চারপাশ খাঁখাঁ করছে। কোথাও পানির চিহ্ন নাই। প্রচণ্ড পিপাসায় সবাই যেন মারা যাবে এমন কঠিন পরিস্থিতি। আলা হাজরামি ঘোড়া থেকে নেমে দু রাকাত নামাজ আদায় করলেন, এরপর দোয়া করলেন :

يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم اسقنا

এই দোয়া পড়ার পরই অল্প একটু মেঘ দেখা দিল এবং তা থেকেই প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হল! সবাই তৃপ্তির সাথে পান করলেন, পাত্রগুলো ভরে নিলেন, বাহনের জন্তুগুলোও পিপাসা মিটিয়ে পানি খেল। এরপর চলতে শুরু করলেন। গন্তব্য দারাইন। সামনে পড়ল এক নদী। ওপারে শত্রুরা। এ নদী সাঁতরে পার হওয়ার মতো নয়। বিশাল ও ভয়ংকর। আগে কেউ পার হয়নি, পরেও না। মুরতাদরা সমস্ত নৌকাও জ্বালিয়ে দিয়েছিল, যেন মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে না পারে। হজরত আলা রা. দু রাকাত নামাজ পড়ে আগের দোয়াটি পড়লেন, এরপর ঘোড়ার লাগাম ধরে নদীতে নেমে পড়লেন এবং পেছন ফিরে সাথিদের বললেন—আল্লাহর নাম নিয়ে চলে এসো। আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমরা পানির ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আল্লাহর কসম, না আমাদের পা ভিজেছে, না মোজা, এমনকি ঘোড়ার ক্ষুর পর্যন্ত ভেজেনি। সেদিন আমরা চার হাজার সৈন্য ছিলাম। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, নদীটি পার হতে পুরো একদিন লেগে যেত। হজরত আফিফ ইবনে মুনজির সে যুদ্ধে শরিক ছিলেন। এ আশ্চর্য ঘটনাটি নিয়ে তিনি একটি কবিতাও লিখেছেন। কবিতাটির তরজমা হল এমন : তুমি কি দেখো না আল্লাহ সমুদ্রকে কীভাবে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন, আর কাফেরদের ওপর নামিয়েছেন কী ভীষণ গজব। আমরা তো সে পবিত্র সত্তাকে ডেকেছি, যিনি বনি

ইসরাইলের জন্য সমুদ্রকে থামিয়ে দিয়েছিলেন; বরং তিনি আমাদের এর চেয়েও বেশি সাহায্য করেছেন।

৫. ওপরে বর্ণিত গরুর কথা বলার ঘটনাটিও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তব্য, উল্লেখিত নানা ঘটনা ইত্যাদি দ্বারা প্রমাণিত হল, সফলতার সঠিক পথ শুধু এটিই যে, রাজনীতিতে শরিয়ত সমর্থিত পন্থা ও কৌশলগুলোই কেবল গ্রহণ করা। এরপর জাগতিক বিচারে সাফল্য যদি না-ও আসে, প্রকৃত সাফল্য আল্লাহর সন্তুষ্টি তো অবশ্যই লাভ হবে। মানুষকে আদেশও তা-ই দেওয়া হয়েছে : বৈধ পথ ও কৌশল গ্রহণ করে সেমতো কাজ করে যাবে, পরিণতি ও ফলাফল দেখা তার দায়িত্ব নয়। এ দায়িত্ব আল্লাহ নিজের জিম্মায় রেখে দিয়েছেন। নিজেদের দায়িত্ব ঠিকমতো আদায় করার পর এবার আমরা হারি বা জিতি, আমাদের সফলতায় এটি কোনো প্রভাবই তৈরি করবে না। আল্লাহর নিকট আমরা সর্বাবস্থায় সফল বলেই বিবেচিত হব। হারাম ইবনে মিলহানের ঘটনাটিই দেখুন। এক কাফের এসে আচানক তাকে বর্শা মেরে বসল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। হারাম ইবনে মিলহান লাল টকটকে রক্ত হাতে নিয়ে চেহারায় মাখলেন আর উচ্ছ্বাসের সাথে বললেন, কাবার রবের কসম, আমি সফল। খেয়াল করে

দেখুন, তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। জাগতিক বিচারে তো এটা ব্যর্থতা। কিন্তু একেই তিনি বলছেন কামিয়াবি।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

وَمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

আর যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে
অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী,
অচিরেই আমি তাকে দেব মহা পুরস্কার।[75]

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِۦٓ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ

বলো, 'তোমরা কেবল আমাদের জন্য দুটি কল্যাণের একটির জন্য অপেক্ষা করছ, আর আমরাও তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি যে, আল্লাহ তোমাদের তাঁর পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাত দ্বারা আজাব দেবেন। অতএব তোমরা অপেক্ষা করো, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ।[76]

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জানমাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা

মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে।[77]

এই আয়াতগুলোতে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাঁর পথে জিহাদ করে, বিজয়ী হোক বা পরাজিত, জীবিত থাকুক বা নিহত, সকল অবস্থায় তাদের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ, জাগতিক হিসাবমতে যত যা-ই ঘটুক, আসল উদ্দেশ্য তারা লাভ করতে পেরেছে—আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাঁকে খুশি করে, তার শরিয়তের বিধিনিষেধ ও সীমানাগুলো মান্য করে ইমানের পথে অটল ও অবিচল থাকার পর তারা যদি বিজয়ী হয়, তাহলে সফল হবে; পরাজিত হলেও সফলই হবে।

কুরআনুল কারিমে জায়গায় জায়গায় সমস্ত কামিয়াবি ও সফলতা শুধু তাদের জন্যই বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ তায়ালার অনুগত হয়ে তাঁর সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে চলেছে। এমন গুণের কথা উল্লেখ করার পরই বলা হয়েছে—أولئك هم المفلحون (তারাই সফলকাম), أولئك هم الفائزون (তারাই কামিয়াব), قد أفلح المؤمنون (নিশ্চয়ই কামিয়াব হয়েছে তারা, যারা ইমান এনেছে...), خسر الا الذين امنوا وعملوا الصلحت إن الانسان لفي (নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কেবল তারা নয়, যারা এনেছে ইমান এবং করেছে সৎকর্ম...)

এ আয়াতগুলোতে আমরা দেখি আল্লাহর অনুগত বান্দাদের বাহ্যিক জয় ও পরাজয়—উভয় অবস্থাতেই

সফল বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। কোনো কোনো ঘটনায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হতে পারে তারা সফল হননি; কিন্তু দুনিয়ার বাহ্যিক সফলতা কাঙ্ক্ষিত হলেও মূল লক্ষ্য নয়। মূল লক্ষ্য হল আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি। এই সন্তুষ্টি পাওয়ার একমাত্র রাস্তা হল তাঁর একনিষ্ঠ আনুগত্য ও গুনাহের কাজ এড়িয়ে চলা। যদি জাগতিক সফলতাই মূল উদ্দেশ্য হত, তাহলে আমরা এ কথা বলতে বাধ্য হতাম—অনেক নবি আপন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ ছিলেন। নাউজুবিল্লাহ। কারণ, তারা রাষ্ট্রক্ষমতা পাননি, এমনকি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্যমতে কোনো কোনো নবির অনুসারী ছিল মাত্রই একজন। এমনও হয়েছে—কোনো কোনো নবি একজন অনুসারীও পাননি। সে সাথে কুরআনুল কারিমে কয়েক জায়গায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, অনেক নবিকে হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে। এই নবিগণ কি ব্যর্থ ছিলেন? কখনোই নয়। সুতরাং, নবিগণ যে দীন নিয়ে এসেছেন, শেষ নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দীন দিয়ে গেছেন—ইসলাম, এ ইসলামের কাছে সফলতার অর্থ পুরোপুরি অন্যরকম। একে জাগতিক হিসাব দিয়ে কোনোভাবেই মাপা যাবে না, বোঝাও যাবে না। এখানে সফলতা মানে আল্লাহ নির্দেশিত পথে, তাঁর শরিয়ত পূর্ণরূপে মান্য করে ইসলামের পথে অটল ও অবিচল থাকা এবং এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হাসিল করা। ব্যস্, এরপর জাগতিক সাফল্য, রাষ্ট্রক্ষমতা,

শাসন ও সিংহাসন পাওয়া না পাওয়াতে কিচ্ছু যায় আসে না। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে জীবনভর সে পথে চলার তাওফিক দান করুন। সকল ফেতনা থেকে আমাদের কেবল তিনিই রক্ষা করতে পারেন এবং সূচনা ও সমাপ্তিতে প্রশংসা কেবল তাঁরই।

২৪ রমজান ১৩৯৭ হিজরি। •

উপসংহার

ইসলাম ও সেক্যুলারিজম

সেক্যুলারিজমের পরিচয়

সেক্যুলারিজম কী—এ নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বড় রকমের তর্ক আছে। ফলে এর পরিচয় হিসেবে নির্দিষ্ট একটি সংজ্ঞা হাজির করা মুশকিল।

কারও মতে এটি একটি মতাদর্শ ও বিশ্বাস। এ বিশ্বাসমতে রাষ্ট্র শিক্ষা ও নৈতিকতার জায়গা থেকে ধর্মকে দূরে রাখা আবশ্যক। এগুলোর কোনোটিতেই গির্জা ও ধর্মীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রভাব স্বীকার করা উচিত নয়। পাশাপাশি এটাও মনে করে —ধর্ম নয়, মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ তার নিজস্ব জ্ঞান ও বুদ্ধি। শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ দিয়েই মানুষ সকল অনিষ্টতা, অকল্যাণ ও পতন থেকে

উত্তোলিত হয়ে সত্য ও সুন্দরের পথে এবং ন্যায় ও মানবিকতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে। সুতরাং, সমস্ত গায়েবি বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে হবে। ছুড়ে ফেলতে হবে সেসব, যা আমরা প্রকৃতিতে খুঁজে পাই না।

কেউ বলেন, এটি এমন এক মতবাদ, যার মূল দর্শন হল—মানুষের চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা, মানব-উন্নয়ন ও বিকাশ এবং মূল্যবোধ—ধর্ম এগুলোর কোনোটিরই ভিত্তি হতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষতা মানেই হল গির্জা ও তার সকল অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের সমুদয় সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত করার নাম। রাষ্ট্র এসব দিয়ে সমকালীন উদ্ভূত সংকটগুলোর মোকাবেলা করবে।

আবার সংক্ষিপ্ত শব্দে কেউ কেউ এভাবেও বলেছেন—ধর্মনিরপেক্ষতা মূলত একটি সামাজিক আন্দোলন, যার লক্ষ্য মানুষের মনোযোগ পরকাল থেকে সরিয়ে শুধুমাত্র ইহকাল ও পার্থিব জগতের অভিমুখী করে দেওয়া।

কেউ বলেছেন—ধর্মনিরপেক্ষতা হল মানুষের জীবনের ভেতর গড়ে তোলা একটি বিশেষ প্রবণতা, যার মূল দর্শন দাঁড়িয়ে আছে এ কথার ওপর—ধর্মীয় বিবেচনাসমূহ রাষ্ট্রপরিচালনায় কোনো ধরনের ভূমিকা রাখতে পারবে না। চারিত্রিক ও নৈতিক বিষয়ে এটি একটি সামাজিক শৃঙ্খলার নাম। একটি বিশেষ দর্শন। মানুষের পারস্পরিক সহাবস্থান, মানুষের বিনিময় ও

আচরণ এবং চরিত্র ও নৈতিকতাসংক্রান্ত সমস্ত মূল্যবোধ গড়ে উঠবে শুধুমাত্র দুটো জিনিসের ওপর ভিত্তি করে : 1. সমকালীন জীবনপ্রবাহের দাবি। 2. সামাজিক নিরাপত্তা।

এ ক্ষেত্রে ধর্ম ও ধর্মীয় নির্দেশনাগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করা সঠিক নয়।

অন্য শব্দে এভাবেও বলা হয়েছে—ধর্মনিরপেক্ষতা পরিপূর্ণ একটি জীবন-পরিচালনাব্যবস্থা। জগৎ বিষয়ে এর সুস্পষ্ট একটি দর্শন ও বিস্তারিত একটি স্বপ্ন রয়েছে। এটি পরকাল ও সমস্ত গায়েবি বিশ্বাস সম্পূর্ণ নাকচ করে। এর নিজস্ব কিছু নৈতিকতা-সূত্র আছে, যার ভিত্তি দুটি জিনিসের ওপর : 1. বুদ্ধি ও বিবেকবাদিতা। 2. উপকার ও কল্যাণবাদিতা।

কুয়েতের রাজনীতিকোষে এর পরিচয়ে বলা হয়েছে—ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী হল ধার্মিকের সম্পূর্ণ বিপরীত। এটি একটি পরিভাষারূপে ব্যবহার করা হয় এবং এ দিয়ে ইঙ্গিত করা হয় জীবনের একটি বিশেষ প্রবেশপথের দিকে, যা পরিপূর্ণরূপে দীনমুক্ত। শুধুমাত্র সমকালীন জাগতিক বিষয়ের প্রতি সমস্ত মনোযোগ ও গুরুত্ব ঢেলে দেওয়ার মাধ্যমে এটি একটি দর্শন আকারে হাজির হয়।

এর দুটো স্তর রয়েছে : ক. ব্যক্তিপর্যায়ে, খ. সামষ্টিক পরিসরে।

ক. ব্যক্তিপর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষতা হল মানুষের ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতি দূরীভূত করা এবং শুধুমাত্র

ইহকালীন জীবন, সম্পর্ক, বিনিময়, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো কেন্দ্র করে একটি সম্পূর্ণ জাগতিক আবেগ গড়ে তোলা।

খ. এ হল ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সেক্যুলারিজমের পরিচয়, লক্ষ্য ও প্রবণতা। অপর দিকে, অনেক ব্যক্তি মিলে যে বৃহত্তর জনপরিসর ও সমাজ-জীবন গড়ে ওঠে, সে প্রেক্ষিতে সেক্যুলারিজম মানে হল—এটি এমন একটি মতবাদ, যেটি বিশ্বাস করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে ধর্মীয় নির্দেশনা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রভাব দূরে রাখা জরুরি। এর মধ্যে শিক্ষা, আইন, প্রশাসন ও রাষ্ট্রপরিচালনাও অন্তর্ভুক্ত।

এমন আরও অনেক সংজ্ঞা পাওয়া যায়।

সেক্যুলারিজমের যে সংজ্ঞা আমরা দেখি, সন্দেহ নেই, এ থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন তৈরি হয় এবং চিন্তক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এ নিয়ে বিস্তর তর্কও রয়েছে। সবগুলো তর্কই যে সম্পূর্ণ অ্যাকাডেমিক, তা নয়; ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের অনেক ব্যাপারও এখানে আছে।

মুসলিম সেক্যুলারদের নতুন ব্যাখ্যা

মুসলিম জাতির মধ্যে যেহেতু সামগ্রিকভাবে একটা দীনি চেতনা সবসময় বিদ্যমান, তাই তাদের সামনে সেক্যুলারিজমের পশ্চিমা সংজ্ঞা নিয়ে হাজির হলে কিছুতেই মানতে চাইবে না। এজন্য আমরা দেখি আরবের (ও অন্যান্য মুসলিম দেশের) সেক্যুলাররা

নিজের মতো ধর্মনিরপেক্ষতার একটি সংজ্ঞা তৈরি করেছেন এবং বেশির ভাগ পশ্চিমা সংজ্ঞাগুলোতে ধর্মদ্রোহিতা ও ধর্মহীনতার যে মর্ম ছিল, সেগুলোকে নিজেদের সংজ্ঞায় চুপিসারে লুকিয়ে ফেলতে চান।

এমনিভাবে দাবি করেন, ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি শুধুমাত্র রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এটা একটা কৌশলমাত্র। এর মাধ্যমে তারা ধর্মীয় দিক থেকে উঠে আসা প্রশ্ন ও আপত্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চেষ্টা করেন।

কারণ, মুসলিম কান্ট্রির বেশির ভাগ মানুষ রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে শরিয়তের প্রতি মনোযোগী না হলেও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে গভীর দীনি চেতনা লালন করেন এবং বাস্তবে যে যতটুকুই শরিয়ত পালন করুক, অন্তত বোধ ও বিশ্বাসগতভাবে এ কথার ওপর অবিচল যে, আমাদের জীবনপ্রবাহটি একমাত্র ইসলাম দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হোক। বিশেষ করে মূল্যবোধ, নৈতিকতা, চারিত্রিক বিষয়াবলি এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে এ চেতনাটি অনেক গভীর।

সেক্যুলারিজমের যে আসল পরিচয় ও মূল মর্মটি, যেটি শুধু রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিব্যপ্ত হয়ে সবকিছু আচ্ছাদিত করে ফেলে এবং ধর্ম ও ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো সরিয়ে দিয়ে সেখানে নিজেই আলাদা এক ধর্ম আকারে প্রতিস্থাপিত হয়, আরবের বেশির ভাগ সেক্যুলার এই

অপকৌশলের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার সে বাস্তব পরিচয়টি পর্দার অন্তরালে লুকিয়ে ফেলেন। এবং এ ছাড়া তাদের উপায়ও নেই আসলে।

এই যে সেক্যুলারিজমের মূল দর্শন ও ইসলামের মাঝে সমন্বয়ের অদ্ভুত প্রচেষ্টা, এ কারণেই তারা নতুন নতুন সংজ্ঞা তৈরি করতে বাধ্য হয়েছেন; কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি জিনিসকে জোর করে একত্র করতে গেলে যা হওয়ার কথা, এখানেও তা-ই হয়েছে। একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়—এগুলোতে অসম্পূর্ণতা অস্থিরতা দ্বিধা অসংহতি ও আত্মদ্বন্দ্বমূলক অসঙ্গতির পরিমাণ অনেক। এই সংকটে পড়ে কেউ কেউ এ কথাও বলে বসেছেন, সেক্যুলারিজম পরিভাষাটিরই আমাদের দরকার নেই। আমরা বরং বুদ্ধিবাদিতা, গণতন্ত্র এ জাতীয় কোনো পরিভাষা ব্যবহার করব।

সেক্যুলারিজমের সূচনা ও পরিণতি

নতুন সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে এই অস্থিরতা তো আছেই, এর বাইরে সেক্যুলারিজমের প্রসিদ্ধ যে সংজ্ঞাটি, অর্থাৎ 'ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা', এটিকেও তারা নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করে বৈধ করতে চান। তারা বলেন, কথাটির প্রকৃত মর্ম বুঝতে আমাদের ইতিহাসের মূলের কাছে ফিরে যেতে হবে। এরপর তারা ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় নির্ধারণে এমন এক

ঐতিহাসিক সূত্র ও মর্ম পেশ করেন, বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্ব নেই।

কারণ, ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন, ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষতার সূচনাটি কীভাবে হয়েছিল। তারা ধর্মকে প্রথমে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে, এরপর সেই চেতনা ও প্রবণতা ক্রমশ উন্নতি করে একসময় ধর্মকে পুরো জীবন থেকেই বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এভাবে তারা একটি সূচনা থেকে ক্রমশ এগিয়ে একটি পরিণতিতে পৌঁছেছে। এটা একদমই স্বভাবজাত একটা গতি। রাষ্ট্র থেকে ধর্ম আলাদা করার মাধ্যমে প্রথম পদক্ষেপটি নেওয়ার পর ধর্মকে পুরো জীবন থেকেই বিচ্ছিন্ন করার পরিণতিতে পৌঁছা পর্যন্ত এ গতি কখনোই থামবে না। বর্তমান মুসলিম জাতি ঠিক এই সূচনার পথটি ধরেই পরিণতির দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে।

এ বইয়ের আলোচ্য সেক্যুলারিজম

এই বইয়ের মূল আলোচনায় 'সেক্যুলারিজম' বলতে আমরা কী বুঝিয়েছি, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হওয়ার জন্য এই জায়গাটা চিহ্নিত হওয়া জরুরি। এখানে সেক্যুলারিজম বলতে আমরা বুঝিয়েছি—অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিসহ রাজনীতির যে পূর্ণ ধারণা ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মযজ্ঞ, সেখান থেকে সমস্ত ইসলামি মূল্যবোধ খুলে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। অনেক ইসলামপন্থি বুদ্ধিজীবী ও চিন্তক

এ ক্ষেত্রগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষতা কবুল করে বসেছেন এবং তাদের বক্তব্য, বিশ্লেষণ ও প্রস্তাবনা এর ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়েছে; কিন্তু পশ্চিমা সংজ্ঞায় ধর্মনিরপেক্ষতার যে সর্বগ্রাসী রূপ, সে পর্যন্ত তারা এখন অবধি পৌঁছাননি।

সীমিত করার কারণ

আলোচনাকে এ ধারায় সীমিত করার দুটো কারণ রয়েছে :

1. মূল ধর্মনিরপেক্ষতাটি একটি আগ্রাসী পশ্চিমা প্রকল্প। ইসলামি বা অন্য কোনো জাতির দর্শন ও বিশ্লেষণ থেকে এটি গড়ে ওঠেনি। এই বইয়ে যেহেতু ইসলামি রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদটি কীভাবে বিকশিত হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করে দেখানো উদ্দেশ্য, তাই সেটি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।
2. বেশির ভাগ ইসলামি চিন্তক এখন পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামি মূল্যবোধ থেকে পুরোপুরি বিচ্যুত হতে পারেননি; বরং তাদের বেশির ভাগই পশ্চিমা মূল সেক্যুলারিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা ও চেতনা লালন করেন।

সেক্যুলারিজমের প্রকরণ ও বিন্যাস

অনেক গবেষক নানা দিক বিবেচনায় সেক্যুলারিজমকে কয়েক ভাগে ভাগ করেছেন। ড. আবদুল ওয়াহহাব মাসিরির ভাগটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। তিনি বলেন, সেক্যুলারিজম মূলত দুই প্রকার : আংশিক সেক্যুলারিজম ও পূর্ণ সেক্যুলারিজম।

আংশিক সেক্যুলারিজম হল শুধুমাত্র রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করা।

পূর্ণ সেক্যুলারিজম একটি পরিপূর্ণ জগৎদর্শন; রাষ্ট্র কিংবা ব্যাপক পরিসরে প্রবাহিত জনজীবনের কিছু দিক থেকে ধর্মকে আলাদা করার মধ্যে এটি সীমিত নয়; বরং এটি ধর্মীয়, চারিত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধকে প্রথমে সামগ্রিক জীবন ও সমাজ পরিক্রমা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, অতঃপর এই মিশন নিয়ে এটি প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিজীবনে গিয়েও হাজির হয়। ব্যক্তির বিশ্বাস ও পবিত্রতাবোধ নিশ্চিহ্ন করে দেয়, বস্তুকেন্দ্রিকতাকে তার চিন্তার কেন্দ্রভূমিতে স্থাপন করে এবং সকল বিষয়ে নিরেট মনোভাব দূর করে দিয়ে একধরনের হেঁয়ালিপূর্ণ আপেক্ষিকতার মনোভাব সৃষ্টি করে।

সেক্যুলারিজমের নেতিবাচক প্রভাব

সর্বগ্রাসী মূল সেক্যুলারিজমটি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার দ্বারা অনেক ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে নৈতিক ও

চারিত্রিক মানদণ্ডগুলো হারিয়ে গেছে। সে জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরিপূর্ণ মূল্যবোধহীন নিছক দক্ষতা ও কথিত সমতার মানদণ্ড।

ফলে অর্থনীতিকে নিছক অর্থনৈতিক মানদণ্ড দিয়ে বিচার করা হয়, রাজনীতিকে মাপা হয় শুধুমাত্র রাজনৈতিক মানদণ্ড দিয়েই, এবং এখান থেকেই জন্ম নিয়েছে 'আর্ট ফর আর্ট' একটি কুসংস্কার; অর্থাৎ, শিল্প নির্মাণ করতে গিয়ে নৈতিকতা, চরিত্র বা ধর্ম—কোনো কিছুকে গ্রাহ্য করা যাবে না; বরং এখানে একমাত্র অন্বেষা হবে সৌন্দর্যের। এবং বিষয়টি এত দূর এগিয়েছে, এখন নারী-পুরুষের ধারণাটি পর্যন্ত বিচার করা হচ্ছে শুধুমাত্র দেহকেন্দ্রিকতা দিয়ে, চারিত্রিক ও নৈতিক দিক থেকে সে বিচার যত আপত্তিজনকই হোক।

দ্বিতীয় আরেকটি ভাগ

সেক্যুলারিজমের প্রসিদ্ধ আরেকটি ভাগ আছে—চরমপন্থি ও মধ্যপন্থি।

চরমপন্থি সেক্যুলারিজম হল, যেটি ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং পরিপূর্ণরূপে ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে, এতে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়, নবি-রাসুলকে অস্বীকার করা হয়, নাকচ করা হয় গায়েবের সকল বিশ্বাস, এবং ধর্মের অনুসারীদের তার শত্রুতার প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে।

মধ্যমপন্থি সেক্যুলারিজম হল, যেটি শুধুমাত্র ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করার কথা বলে। ফলে এতে একদিকে যেমন আল্লাহ ও রাসুলের অস্তিত্ব এবং গায়েবের বিশ্বাসগুলোকে নাকচ করা হয় না, অপরদিকে সরাসরি ধর্ম ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করে না; কিন্তু এ ধারার অনুসারীরা দীনকে ব্যাখ্যা করেন অসম্পূর্ণভাবে। তারা মনে করেন, ধর্ম মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়; রাষ্ট্র ও সমাজ পরিসরে এর কোনো ভূমিকা নেই।

এই ভাগটি মূলত পশ্চিমা মূল সেক্যুলারিজম ইসলামি রাজনীতিবিদ, দায়ি ও আলেমদের ওপর যে ভয়ানক চাপ তৈরি করেছিল, সেখান থেকে জন্ম নিয়েছে। এই চাপের মুখে পড়ে তাদের কেউ কেউ মন্দের ভালো নীতিতে তালাশ করতে লাগলেন ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য কোন সেক্যুলারিজমটি বেশি ক্ষতিকর, কোনটি কম।

ইউরোপে যেভাবে গড়ে উঠল সেক্যুলারিজম

সেক্যুলারিজম নির্ভেজাল পশ্চিমা একটি দর্শন। পশ্চিমে জন্ম হয়েছে এবং সেখানেই ডালপালা ছড়িয়ে বিশাল মহিরুহের আকৃতি ধারণ করেছে। এরপর পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একে পরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবীজুড়ে।

সুতরাং, এটি এমন বিশেষ কোনো চিন্তা নয়, যেটি মানুষের স্বভাবজাত প্রবণতা থেকে স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয়েছে; এমনও নয় যে চিন্তাটি আপন বিভা ও উৎকর্ষের কারণে মহাদেশগুলোতে বিস্তৃত হয়েছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে, এবং পৃথিবীর চিন্তার ইতিহাসে এটিই একমাত্র শেষ কথা নয়। ব্যাপারটি কোনোভাবেই এমন নয় যে, এর বিপরীতে অন্য কোনো চিন্তা হাজির হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই; বরং এটি সাধারণ একটি চিন্তামাত্র, যাকে অধুনা পশ্চিমা সভ্যতা বিশেষভাবে গড়ে তুলেছে এবং ইতিহাসের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে আজকের এই রূপে এসে উপনীত হয়েছে।

খ্রিষ্টবাদের সাথে সেক্যুলারিজমের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আরও সূক্ষ্মভাবে বললে—খ্রিষ্টবাদ নয়; পৌলবাদের সাথে। ইউরোপে একদম সূচনার সময়ে ধর্ম মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং খ্রিষ্টবাদ গ্রহণ করা হয়েছিল শরিয়ত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নিছক একটি আকিদা ও বিশ্বাসরূপে। শরিয়ত বা ধর্মীয় জীবনবিধান ইউরোপকে কখনোই শাসন করেনি, খুব সামান্য কিছু পরিসর ছাড়া।

ইউরোপীয় রেনেসাঁ-পরবর্তী সময়ে নব আবিষ্কৃত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে ইউরোপীয় সমাজ-জীবনের অল্প কিছু ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্তভাবে ধর্মের যে-সকল অনুশাসন তখনো বাকি ছিল, সেগুলোকেও তারা ছুড়ে ফেলল এবং ধর্মকে সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও

রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করল। এমনকি তাদের চিন্তাচেতনা ও অনুভূতি থেকে পর্যন্ত মুছে গেল ধর্মের সামান্য বোধ।

কিন্তু আমাদের দেশের বিষয়টি ছিল অন্যরকম। ইসলাম মুসলিম কান্ট্রিগুলোকে শাসন করেছে যুগের পর যুগ। এখানে শরিয়তের বিধানাবলি পালিত হয়েছে, আকিদা-বিশ্বাসের প্রচারপ্রসার ও লালন হয়েছে ব্যাপকভাবে। ফলে ইসলামি বিশ্বের হৃদয়ে সেক্যুলারিজম অনুপ্রবেশের বিষয়টি ছিল খুবই কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং।

পাশাপাশি ইউরোপে আরও কিছু বিষয় ছিল, যেগুলো সেখানের মাটিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। যেমন :

মধ্যযুগে ইউরোপিয়ানদের মন-মস্তিষ্ক ও দেহ ভয়ংকরভাবে গ্রাস করে রেখেছিল গির্জাগুলো। ফলে ব্যাপকভাবে তারা এই জুলুম থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের চিন্তা ও আন্দোলনগুলো এমনভাবে গঠিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র গির্জা থেকে মুক্ত হওয়ার পরিবর্তে তারা পুরোপুরি ধর্ম থেকেই বেরিয়ে এসেছিল।

আরও একটি কারণ ছিল—পৌত্তলিক গ্রিক সভ্যতার প্রভাব। এই সভ্যতা মানুষ ও সৃষ্টিকর্তার মাঝে এমন এক সম্পর্কের ধারণা গড়ে তুলেছিল, যা কেবল দুজন শত্রুর মাঝেই হতে পারে। এ সম্পর্ক সর্বদাই প্রবল দ্বন্দ্বমুখর। মানুষ এর মুখে দাঁড়িয়ে

সবসময় বিবমিষায় আক্রান্ত হয়েছে, গোপন ক্ষোভের অনলে পুড়েছে; কখনো শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে পারেনি; কিন্তু এ সবকিছু মেনে নেওয়া ছাড়া বাহ্যত তাদের কিছুই করার ছিল না। সে সময়ে ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদটি কল্পিত সেই প্রভুদের কবজা থেকে নিষ্কৃতি লাভের অব্যর্থ এক অবলম্বন হিসেবে তাদের সামনে হাজির হয়েছিল।

এভাবেই ইউরোপিয়ানদের কাছে ধর্মের বিষয়টি গুরুত্বহীন ও পরিত্যাজ্য হয়ে পড়ে। তারা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিল ধর্ম কখনোই মানবিক মূল্যবোধের উৎস হতে পারে না। ধর্মের পরিবর্তে তারা গ্রহণ করল প্রকৃতিপূজা, আর সেক্যুলারিজমকে গ্রহণ করল মহান একটি ধর্ম হিসেবে, যে ধর্মটি আসমান থেকে নাজিল হয়নি; নিজেরাই গড়ে নিয়েছে, মাটির পৃথিবীতেই, নিজেদের সুবিধামতো।

শরিয়তের দৃষ্টিতে সেক্যুলারিজমের বিধান

সেক্যুলারিজমকে আপনি যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করুন এবং যে আকৃতিতেই উপস্থাপন করুন, কোনোভাবেই এটি ইসলামের সাথে যায় না। সংক্ষিপ্তভাবে নয়, বিস্তারিত আকারেও নয়। কারণ, ইসলাম মানেই আল্লাহর বিধানের সামনে নতজানু হয়ে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করা। আর সেক্যুলারিজম ঠিক এর উলটোটাই শিক্ষা দেয়। অর্থাৎ, শরিয়তের বক্তব্যগুলো

এড়িয়ে চলা এবং মানুষের জীবনে আল্লাহ মনোনীত শরিয়তটি মূল কেন্দ্র আকারে হাজির হওয়াকে অস্বীকার করার প্রবণতা ও উদ্দীপনা তৈরি করে।

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতার সংঘাত

ইসলামের সাথে সেক্যুলারিজমের সংঘর্ষের জায়গাগুলো সংক্ষিপ্তভাবে এমন :—

১. সেক্যুলারিজম—আল্লাহর রুবুবিয়াতের মধ্যে শিরক

রুবুবিয়াত মানে হল জাগতিক ও শরয়ি—সকল বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র কর্তৃত্বের অধিকারী, সার্বভৌম ক্ষমতাবান। এ প্রসঙ্গে দুটো বিষয়কেই একসাথে উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—الا له الخلق والامر

জাগতিক বিষয় : যেমন, সৃষ্টি করা, গঠন ও উৎপন্ন করা, অস্তিত্বে আনা, জগৎ পরিচালনা করা, এর সমস্ত কর্ম ও বিষয় সম্পন্ন ও সম্পাদন করা ইত্যাদি।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون

শরয়ি বিষয় : যেমন, আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম ও শরিয়তের অন্যান্য বিধান।

শরয়ি বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাকে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী বিশ্বাস করার অর্থ হল, আল্লাহ যা হালাল করেছেন এর বাইরে আর কোনো হালাল নেই; তিনি

যা হারাম বলে ঘোষণা করেছেন, এর বাইরে অন্য কোনো হারাম নেই, এবং আল্লাহপ্রদত্ত শরিয়তের বাইরে আর কোনো দীন নেই।

আদি ইবনে হাতিম রা. একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তেলাওয়াত করতে শুনলেন اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله— (আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের ধর্মগুরুদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে), তখন তিনি বললেন, আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না! নবিজি বললেন, ব্যাপারটি কি এমন ছিল না যে, আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তারা সেগুলোকে হারাম বলে ঘোষণা করত, এরপর তোমরাও তা হারাম বলে বিশ্বাস করতে; এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তারা সেগুলোকে হালাল বলে ঘোষণা করত, তারপর তোমরাও তা হালাল বলে বিশ্বাস করতে? আদি ইবনে হাতিম রা. বললেন, হ্যাঁ, বিষয়টি এমনই ছিল। নবিজি বললেন, এটিই তাদের উপাসনা করা।

এদিকে সেক্যুলারিজম দাবি করে, রাজনীতিতে ধর্ম অচল এবং ধর্মের ভেতরে রাজনীতির কোনো বিষয় নেই। সুতরাং, ঐশী বিধানাবলি বলতে কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়; বরং মানুষ যে আইনের ওপর একমত হবে, কেবল সেটিই হবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ও পালনীয়। আইনপ্রণয়নের বিষয়টি দীন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও পরিপূর্ণরূপে দীনের আওতামুক্ত।

অন্যভাবে বললে, সেক্যুলারিজম শরিয়তের বিধানাবলির পুরো বিষয়টিকেই অস্বীকার করে।

২. সেক্যুলারিজম—উলুহিয়্যাতের মধ্যে শিরক

উলুহিয়্যাতের একত্ববাদ বা ইলাহ ও উপাস্য হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালাকে এক বলে স্বীকার করার মধ্যে বড় দুটি বিষয় রয়েছে :

নিয়ত ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে একত্ববাদ : অর্থাৎ, নামাজ রোজা হজ নজর-মান্নত ইত্যাদি এবাদত জাতীয় সকল কিছু একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করা এবং এসবের জন্য তিনিই একমাত্র উপযুক্ত ও একচ্ছত্র দাবিদার বলে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করা।

আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে একত্ববাদ : অর্থাৎ, পূর্ণ আনুগত্য ও সবিনয় সমর্পণ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই হওয়া। আর এটি বাস্তবায়িত হবে যখন জীবনের সকল বিষয়ে তাঁর শরিয়তকে ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করা হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

বলুন, নিশ্চয়ই আমার রব আমাকে সিরাতে মুস্তাকিমের দিশা দিয়েছেন। ...এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। বলুন,

নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ সকল কিছু একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই, যিনি সকল জগতের রব। তাঁর কোনো শরিক নেই। এবং এর জন্যই আমাকে আদেশ করা হয়েছে। আর আমি প্রথম মুসলমান।[78]

প্রথম আয়াতটি আনুগত্য ও অনুসরণ বলতে কী বোঝায় সেদিকে ইঙ্গিত করছে এবং পরের দুটো আয়াত ইঙ্গিত করছে ইচ্ছা ও নিয়তের একত্ববাদের দিকে। সুতরাং, আল্লাহর শরিয়তের বাইরে অন্য কিছুকে ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করা হল ইবাদতের মধ্যে শিরক। এ কারণে সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, সিদ্ধান্ত ও ফয়সালা প্রদানের জায়গা থেকে আল্লাহর শরিয়তকে হটিয়ে দেওয়া অনেক বড় অপরাধ।

৩. সেক্যুলারিজম—নবুয়তের মধ্যে কলঙ্ক

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিপূর্ণ একটি দীন দিয়ে পাঠানো হয়েছে, যার মধ্যে আকিদার বিষয়গুলো যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে শরিয়ত বা আল্লাহপ্রদত্ত বিধিবিধান। সকল মুসলমানের জন্য আবশ্যক হল তিনি যে সকল বিষয় জানিয়ে গেছেন, সবকিছুকে সত্য বলে দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করা এবং

শরিয়ত আকারে যে আদেশ ও নিষেধ রেখে গেছেন, তার পরিপূর্ণ অনুসরণ করা।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, অপরদিকে তাঁর নবিকে রাসুল হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করার অর্থ হল, সবিনয় আত্মসমর্পণের সাথে তাঁর অনুসরণ করা এবং তাঁর সামনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করা; এমন যে, তার কাছে তিনি নিজের জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয়।

ফলে সে তার বাণী ছাড়া অন্য কোথাও থেকে আলো ও হেদায়েত গ্রহণ করে না, জীবনের সকল বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ হতে ফয়সালাকারী হিসেবে একমাত্র তাঁকেই গ্রহণ করে; বিপরীতে অন্য কাউকে সিদ্ধান্তদাতা হিসেবে মান্য করে না, এবং তিনি ব্যতীত আর কারও ফয়সালায় কখনো সে সন্তুষ্ট হয় না, তা আল্লাহ তায়ালার নামনিচয়, গুণাবলি ও কর্ম বিষয়ে হোক; কিংবা ইমানের মর্মস্বাদ আস্বাদন ও স্তরবিন্যাসের বিষয়ে হোক; হোক এর জাহেরি বা বাতেনি অন্য যেকোনো বিধানের ক্ষেত্রে। কোনো বিষয়েই সে অন্য কারও ফয়সালায় সন্তুষ্ট হয় না।

তার অনুসরণ ও আনুগত্য আবর্তিত হয় আল্লাহর প্রেরিত নবি হিসেবে একমাত্র তাঁকে কেন্দ্র করেই। তাঁর নির্দেশনা ছাড়া অন্য কিছুতেই সে প্রশান্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করে না।

অথচ সেক্যুলারিজম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ে আসা এই শরিয়ত বাতিল করে

দেয়। এবং একে রাজনীতি, অর্থনীতি ও অন্য সকল বিষয়ে মানুষের জীবনে সামান্য ভূমিকা রাখা থেকেও খারিজ করে দেয়।

বলুন, নবুয়তের সাথে এর চেয়ে বড় কুফরি আর কী হতে পারে!

মুসলিম সেক্যুলারদের ইমানের ধরন

সেক্যুলারিজম যখন আল্লাহর শরিয়ত বাতিল করে দেয়, তখন ইমানের মর্ম থেকে আনুগত্যের মূল বিষয়টি হারিয়ে যায়। ফলে, নবিজির আনীত সংবাদসংশ্লিষ্ট বিশ্বাস ছাড়া ইমানের আর কিছুই বাকি থাকে না। এমন ইমান হল নবিজির ব্যাপারে ইহুদিদের বিশ্বাসটির মতো। তারা গভীরভাবে জানত যে তিনি সত্য নবি, তা সত্ত্বেও তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করেনি।

সেক্যুলারিজম মুসলিমজাতির মধ্যে ছড়াল যেভাবে

মুসলিমবিশ্বে সেক্যুলারিজম অনুপ্রবেশের গল্পটি বেশ দীর্ঘ ও কুটিল। এর সূচনা হয়েছিল 19 শতকে, এই ধারা আজও প্রবহমান। এখানে সেই গল্প বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। এ বিষয়ে বিস্তর বইপত্র গবেষণা রচিত হয়েছে।

এখানে আমি বরং বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক করতে চাচ্ছি—

ক. সেক্যুলারিজম একটি জটিল গঠনের দর্শন। এর প্রভাব বিস্তারের পরিধি অনেক প্রশস্ত। যদিও প্রথমে এটি শুরু হয় রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দিয়ে; কিন্তু জ্ঞান ও কর্মগত অসংখ্য ময়দান পাড়ি দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন নিজস্ব গতিতে একসময় গিয়ে এটি উপনীত হয় প্রতিটি মানুষের ব্যক্তি জীবনে। এ হল সেই মরণরোগ, যা দেহকে ধীরে নিঃশব্দে শেষ করে দেয়। এর বিষাক্ততার পরিধি দিনে দিনে একটু একটু করে বিস্তৃত হয়, কিন্তু টেরটি পাওয়া যায় না!

এ বিষয়টিতে সতর্ক করার দরকার ছিল। কারণ, আমি দেখেছি, মুসলিমবিশ্বে সেক্যুলারিজম অনুপ্রবেশের ইতিহাস বলতে গিয়ে অনেকে ভাসাভাসা ও অসম্পূর্ণ বক্তব্য দিচ্ছেন। তারা সেক্যুলারিজম বিস্তারের পুরো বিষয়টি সীমিত করে ফেলছেন সুনির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি বা বিশেষ কিছু গ্রন্থের মধ্যে। কেউ কেউ চিহ্নিত করছেন সে সকল রাজনৈতিক লিডারকে, যারা সেক্যুলার চিন্তা প্রসারে সহায়ক কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি এত সরল নয়; বরং আরও বেশি জটিল ও বৃহৎ।

খ. সেক্যুলারিজম একটি নিরেট পশ্চিমা প্রোডাক্ট। পেছনে এ আলোচনা আমরা করেছি। এবং ইসলামি বিশ্বে এটি অনুপ্রবেশ করেছে বারুদের জোরে, প্রলয়ংকরী ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদের ট্যাংকের পিঠে

চড়ে। মোটের ওপর এ অংশটুকুতে সবাই একমত; কিন্তু এখানে অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও আশঙ্কাজনক বাস্তবতা আছে। এ থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখার সুযোগ নেই। সেই বাস্তবতাটি হল, ইসলামি বিশ্বের ভেতরগত অবস্থা ভালো ছিল না। এর নানা দিকে দেখা দিয়েছিল পতন ও ভঙ্গুরতা। শতাব্দীর পর শতাব্দী এখানে একটি ভয়ানক স্থবিরতা ও উৎকর্ষহীনতা বিরাজ করেছে। নিজেদের ভেতরগত এই শোচনীয় অবস্থাটি ইউরোপিয়ান চিন্তাযুদ্ধের রণক্ষেত্র হিসেবে একে উপযোগী করে তুলেছে। এ মাটি বিষাক্ত বীজের উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে প্রস্তুত হয়েছিল নিজে থেকেই। সেক্যুলারিজম বিস্তারের ইতিহাস লিখতে গিয়ে এ বিষয়টিও অনেকে উপেক্ষা করে গেছেন।

ইসলামি বিশ্বে সেক্যুলারিজম প্রবেশের বিষয়টি একই ধারায় প্রবাহিত হয়নি। একেক ভূমিতে এই যুদ্ধের প্রণোদনা ছিল একেক রকম, ভেতরগত পরিস্থিতিও ছিল বিবিধ। সুতরাং, মুসলিমবিশ্বে সেক্যুলারিজম কীভাবে বিস্তারিত হল, সে গল্প বলার সময় এই দিকগুলো মাথায় রাখা জরুরি। কোনো একটি পরিস্থিতি ও কারণকে সকল দেশের ক্ষেত্রে একাট্টাভাবে প্রয়োগ করা সঙ্গত নয়। •

Notes

[← 1]

. *আশরাফুস সাওয়ানেহ*, খণ্ড : ৪ খাতিমাতুস সাওয়ানেহ, পৃষ্ঠা : ২৮-২৯

[← 2]

. *ফাজাইলুল ইলমি ওয়াল খাশইয়া* : ৩০; *মাআরিফে হাকিমুল উম্মত* : ৬১৭

[← 3]

. Quoted by a Appadorai, The Substance of politics, Oxford University Press 1961 p. 133.

[← 4]

. A. Appadorai, op cit p. 133

[← 5]

. Chartism (1839) as quoted by Appadorai, op cit p.128.

[← 6]

. Roussian, The Social Contract, bk 111, ch. v. as quoted by Appadrai, op cit p. 127

[← 7]

. *তাকলিলুল ইখতিলাত মাআল আনাম* : ৯-১৭; *আশরাফুল জওয়াব* : ৩০১-৩১০, *মাআরিফে হাকিমুল উম্মত* : ৬২০-৬৩০

[← 8]

. *তাকলিলুল ইখতেলাত মাআল আনাম* : ৬১-৬২; *আশরাফুল জওয়াব* : ৪৫৫-৪৫৬

[← 9]

. *ইফাদাত* : ৭, মালফুজ নং : ২৫৯-এর বরাতে *ইসলাহুল মুসলিমিন* : ১৭৯

[← 10]

. *আনফাসে ইসা*, ১:৩৩৭, অধ্যায় : ৪

[← 11]

. *ইসলাহুল মুসলিমিন* : ৫৩৬

[← 12]

. *আল-ইফাদাতুল ইয়াউমিয়া*, ৩:১১১-১১২, মালফুজ নং : ২৫২

[← 13]

. *সহিহ মুসলিম* (*মেশকাত*, আমর বিল-মারুফ অধ্যায়)

[← 14]

. *ইফাদাতে আশরাফিয়া দর মাসাইলে সিয়াসিয়া* : ১০

[← 15]

. *মাহাসিনে ইসলাম বয়ানসমগ্র* : ২৮০, মুলতান সংস্করণ

[← 16]

. *আল-ইফাদাতুল ইয়াউমিয়া*, ৩: ৭৬, মালফুজ নং : ৮৯

[← 17]

. *সহিহ মুসলিম*, ২:১০৬; *সিয়ার*, ২:৩৬২-৩৬৩; ইসাবা, ২:২২৩

[← 18]

. *জামে তিরমিজি*, কিতাবুস সিয়ার, আহলুয যিম্মাহ ইয়াকযুনা অধ্যায়

[← 19]

. *তিরমিজি*, আবওয়াবুস সিয়ার, মা জা-আ ফিল গাদরি অধ্যায়

[← 20]

. *আর-রাওজাতুন নাজিরা*, ইফাদাতে আশরাফিয়া দর মাসায়িলে সিয়াসিয়া : ১০

[← 21]

. *মুআমালাতুল মুসলিমিন*, ইফাদাতে আশরাফিয়া : ২৭-২৮

[← 22]

. দেখুন—*ইমদাদুল ফাতাওয়া*, ৬:২০১

[← 23]

. *ইফাদাতে আশরাফিয়া দর মাসায়েলে সিয়াসিয়া* : ২৮-২৯

[← 24]

. *আল-ইফাদাতুল ইয়াউমিয়া*, ৩ : ৩০, মালফুজ নং : ১৪

[← 25]

. *আল-ইফাদাতুল ইয়াউমিয়া*, ৫:১৩৬, মালফুজ নং : ১৫২

[← 26]

. *আল-ইজাফাতুল ইয়াউমিয়া*, ৫:১৬৮-১৬৯, মালফুজ নং : ১৯০

[← 27]

. *মাজালিসে হাকিমুল উম্মত* : ৯২, মালফুজাত, রমজান ১৩৪৮ হি.

[← 28]

. *আনফাসে ইসা*, ১:৩৭৫, অধ্যায় : ৪

[← 29]

. *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ*, ৫:২২৯, *মুসনাদে আহমদের* সূত্রে বর্ণিত। বর্ণনাকারী সকলেই সিকাহ।

[← 30]

. *ওয়াজুস সবর* : ৩৬, *ইসলাহুল মুসলিমিন* : ৫২২ থেকে গৃহীত

[← 31]

. *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ*, ৫:২৪৯, *তাবারানির* সূত্রে বর্ণিত। এ সূত্রের মধ্যে ইবরাহিম ইবনে রাশেদ রয়েছেন। তিনি মাতরুক—পরিত্যক্ত। *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ২:৩৮৮, *মেশকাত* : ৩২৩

[← 32]

. আজিজিকৃত *আস-সিরাজুল মুনির*, ৪:৪১১। হাদিসটি বর্ণনার পর তিনি বলেছেন, এর সূত্র হাসান।

[← 33]

. *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ*, ৫:২৩৮, *তাবারানির* সূত্রে বর্ণিত। হাইসামি বলেছেন, ইয়াজিদ ইবনে মারসাদ মুআজ থেকে শোনেননি এবং ওয়াদিন ইবনে আতাকে ইবনে হিব্বান প্রমুখ সিকাহ—নির্ভরযোগ্য বলেছেন, তবে অনেকে তাকে জয়িফ বলেছেন। এ ছাড়া অন্য রাবিগণ সিকাহ।

[← 34]

. *ইমদাদুল ফাতাওয়া*, ৫:১২০

[← 35]

. *মাসিক আল-বালাগ*, শাবান-রমজান সংখ্যা, ১৪১০ হিজরি

[← 36]

. *রদ্দুল মুহতার*, ১:৬৬৩

[. 37]

ফাতহুল বারি, ১:১৯৯

[. 38]

. সুরা আলে ইমরান :১৫২

[. 39]

. মোট কথা দাঁড়াল এই—সরাসরি নির্দেশ অমান্য করা বলতে আমরা যা বুঝি, সেই সাহাবাদের ঘাঁটি ছেড়ে আসার বিষয়টি এমন ছিল না; বরং পরিস্থিতির কারণে নবিজির নির্দেশটি তারা ব্যাখ্যা করে সীমিত করে ফেলেছিলেন এবং সে আলোকে তাদের ধারণা অনুযায়ী তারা নির্দেশটি শতভাগ পালন করেছিলেন; কিন্তু তাদের এই ব্যাখ্যা ও সম্পদ জমা করতে যাওয়ার কাজটি ভুল ছিল। এদিকে বাস্তবতার গভীর বিশ্লেষণের আলোকে আমরা তাদের নিয়তের নিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারি না এবং তাদের সাথে পরবর্তী সময়ে যে আচরণ করা হয়েছে, সেখানেও আমরা দেখি তাদের সরাসরি নির্দেশ অমান্যকারী অপরাধী বিবেচনা করা হয়নি। তবে, যারা এমন ব্যাখ্যা না করে শেষ পর্যন্ত ঘাঁটিতে থেকে গিয়ে জীবন দিয়েছিলেন তারা শতভাগ সঠিক অবস্থানে ছিলেন। এজন্য তাদের সঠিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ঘাঁটিতে থেকে যাওয়া লোকদের কাজটিকে আখেরাত এবং ছেড়ে আসা লোকদের কাজটিকে দুনিয়া দিয়ে ব্যক্ত করেছেন এবং বাস্তবতা গভীর নিরীক্ষণ থেকে একে আমরা 'অবশ্য যদিও তা আখেরাত লাভের জন্যই ছিল'—দিয়ে ব্যাখ্যা করেছি।—অনুবাদক

[. 40]

. আল-বাহরুল মুহিত, ৪:২২২

[. 41]

. তাফসিরে ইবনে কাসির, ২:১৭৬

[. 42]

. আদ-দুররুল মানসুর, ৩:৪৬

[. 43]

. প্রাগুক্ত

[. 44]

. বায়হাকি রহ. বলেছেন, হাদিসটি মুনকাতি এবং বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া জঈফ।

[. 45]

. আল-মাকাসিদুল হাসানা : ৩২৬

[. 46]

. আদ-দুররুল মানসুর, ৩:৪৬

[. 47]

. প্রাগুক্ত

[. 48]

. প্রাগুক্ত

[. 49]

. হিলয়াতুল আউলিয়া, ২:৩৮৮

[. 50]

. আল-ইতিদাল : ৮৪

[. 51]

. আল-জামিউস সগির, ১:৬৬

[. 52]

. আল-ইতিদাল : ৮৬

[← 53]

. আল-জামিউস সগির, ২:১৯৯

[← 54]

. প্রাগুক্ত, ২:২০০

[← 55]

. প্রাগুক্ত

[← 56]

. মুস্তাদরাকে হাকিম, ৪:৩২৫

[← 57]

. আদ-দুররুল মানসুর, ২:৩০০

[← 58]

. তিরমিজি, আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামা

[← 59]

. আহমদ, তিরমিজি (মেশকাত, তাওয়াক্কুল ও সবর অধ্যায়)

[← 60]

. আহমদ (মেশকাত, তাওয়াক্কুল ও সবর অধ্যায়)

[← 61]

. আহমদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি (মেশকাত, তাওয়াক্কুল ও সবর অধ্যায়)

[← 62]

. খামিস, ২:২০৫

[← 63]

. প্রাগুক্ত, ২:২৩৫

[← 64]

. প্রাগুক্ত, ২:২২৯

[← 65]

. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭:৩৫

[← 66]

. *খামিস*, ২:২১৬

[← 67]

. *আল-বিদাওয়া ওয়ান নিহায়া*, ২:৬৫

[← 68]

. ইবনুল আসিরকৃত *আল-কামিল*, ২:৪৫৪

[← 69]

. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ৭:৫৩; *তাবারি*, ৩:৯৯

[← 70]

. *মেশকাত* : ৫৪৫

[← 71]

. *মুজামুল বুলদান*, ৪:৪২০

[← 72]

. সুরা আলে ইমরান : 145

[← 73]

. সুরা দুখান : ২৫-২৮

[← 74]

. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, 7:64; *তাবারি*, 3:১১৯

[← 75]

. সুরা নিসা : ৭৪

[← 76]

. সুরা তওবা : ৯

[← 77]

. সুরা তওবা : ১১১

[← 78]

. সুরা আনআম : ১৬১-১৬৩